Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম বনাম হিন্দু ধর্মে নারী মূল্যায়নের পার্থক্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা কবির স্মৃতি

রোলঃ 216020870

২২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম বনাম হিন্দু ধর্মে নারী মূল্যায়নের পার্থক্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা কবির স্মৃতি

রোলঃ 216020870

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম ধর্ম বনাম হিন্দু ধর্মে নারী মূল্যায়নের পার্থক্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা কবির স্মৃতি, আইডিঃ 216020870 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ধর্ম বনাম হিন্দু ধর্মে নারী মূল্যায়নের পার্থক্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sanzida

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২২ জুন, ২০২৪ ইং

সানজিদা কবির স্মৃতি

আইডিঃ 216020870

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক

মানবজীবন হলো দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র।পরকালের সুন্দর শান্তির জীবনের জন্য এই ইহকালের জীবনে নানা পরীক্ষা এবং রবের সন্তুষ্টি আদায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ লগ্ন থেকে নারী এবং পুরুষ উভয় এ একত্রে বসবাস শুরু করেছে।এই যাত্রা একত্রেই শেষ হবে।তাই পুরুষ জীবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ নারী জীবন ও।

নারীদের গুরুত্ব এবং সম্মান নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম কিংবা বিভিন্ন মতবাদে নানানরকম ব্যাখ্যা আছে।তবে বৃহৎ অর্থে ইসলাম ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মে নারীর কেমন মূল্যায়ন করা হয়েছে তার পার্থক্য এখানে আলোচনা হবে।

শুরু থেকে ধর্মের সংজ্ঞা এবং কেন ধর্ম মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা জানতে হবে।ধর্ম সত্য হলে এবং কল্যাণকর হলে এরপর সেখানে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে এর নির্দেশাবলী মানার যোগ্য।

ধবাহিকভাবে এখানে নারী জীবনের বিভিন্ন ধাপে কিভাবে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা

আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।সবশেষে এর সারমর্ম বলা হয়েছে।

ধর্ম কি

ধর্ম হলো একাধিক অর্থবাচক একটি শব্দ। সাধারণত এটি দ্বারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার একটি পরিসরকে বোঝায়, যার মধ্যে রয়েছে মনোনীত আচরণ ও অনুশীলন, নৈতিকতা, বিশ্বাস, বিশ্বদর্শন, পাঠ্য, পবিত্র স্থান, ভবিষ্যদ্বাণী, নীতিশাস্ত্র বা সংগঠন, যা সাধারণত মানবতাকে অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক উপাদানের সাথে সম্পর্কিত করে। যদিও ধর্ম সুনির্দিষ্টভাবে কীসের সমন্বয়ে গঠিত হয় তা নিয়ে বিজ্ঞদের মাঝে রয়েছে মতভেদ। ভারতীয় দর্শন মতে ধর্ম বলতে সাধারণত প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন, শৃঙ্খলা, আচরণ, নৈতিক গুণাবলি ও কর্তব্য, অনুশীলন এবং জীবনযাত্রাকে বোঝায়। বিভিন্ন ধর্মে ঐশ্বরিকতা, পবিত্রতা , আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও এক বা একাধিক অতিপ্রাকৃতিক সত্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদান থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র ইতিহাস ও আখ্যান রয়েছে, যা পবিত্র গ্রন্থ, প্রতীক ও পবিত্র স্থানগুলোতে সংরক্ষিত হতে পারে, যার প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্য জীবনের অর্থ প্রদান। কিছু ধর্মে প্রতীকী গল্প থাকে যা হয়ত চেষ্টা করে জীবনের উৎপত্তি, মহাবিশ্ব ও অন্যান্য ঘটনা ব্যাখ্যা করতে তবে তা কেবল ই পৌরাণিক গল্প; এ সকল ধর্মের কিছু অনুসারী এগুলোকে সত্য গল্প বলে বিশ্বাস করে; অন্যরা এগুলোকে পৌরাণিক কাহিনি হিসেবে বিবেচনা করে।

বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১০,০০০ টি স্বতন্ত্র ধর্ম রয়েছে।[**তথ্যসূত্র:**"Religion – Definition of Religion by Merriam-Webster"] যদিও তন্মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মই অঞ্চল ভিত্তিক, যেগুলোর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনুসারী রয়েছে। চারটি ধর্ম—খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৭% মানুষ অনুসরণ করে এবং বিশ্বের ৯২% মানুষ হয় এই চারটি ধর্মের যেকোনো একটি অনুসরণ করে নতুবা নিজেদের ধর্মহীন হিসেবে পরিচয় দেয়।[**তথ্যসূত্র:**"The Global Religious

Landscape"] অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮% বাকি ৯,০০০+ বিশ্বাস অনুসরণ করে। ধর্মীয়ভাবে অসংলগ্ন লোকেদের মাঝে রয়েছে যাঁরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দেন না, নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা, যদিও এদের অনেকেই তবুও বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী।তাদের কে সমর্থন করেন নিজেদের স্বার্থ অনুসারে।

ধর্মের অধ্যয়নে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মের দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শাখা রয়েছে। ধর্মের তত্ত্বসমূহ ধর্মীয় সত্তা ও বিশ্বাসের সত্তাতত্ত্বের ভিত্তিসহ এর উৎস ও কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ধর্মের ইতিহাস

ধর্মের ইতিহাস বিভিন্ন ধর্মমতে ভিন্ন ভিন্ন, তবে বর্তমান পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্ম অর্থ্যাৎ খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদি ধর্মমতে পৃথিবীর সকল মানুষ একজন পিতা ও একজন মাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই দুইজন আদি পিতা আদম (Adam) ও মাতা হাওয়া (Eve) এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ম। এই তিন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ যথাক্রমে বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট), কুরআন মাজিদ ও তাওরাহ (ওল্ড টেস্টামেন্ট) থেকে এই ঘটনার সুত্র পাওয়া যায়। মানব্জাতির সৃষ্টির পর থেকেই মুলত মানুষের ধর্মের সুত্রপাত। ইসলাম ধর্মমতে আদম (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে আগমনের পর তার প্রাথমিক কাজ ছিল কীভাবে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে হবে তা প্রতিপালন করা এবং এক্ষেত্রে ফেরেশতা জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আদম (আলাইহিস সালাম) কে সহযোগিতা করেছেন। কীভাবে ঘর নির্মাণ করতে হবে, খাবার তৈরী করতে হবে, শিকার করতে হবে এসকল জিনিস ছিল তার প্রাথমিক ধর্ম। পরবর্তিতে আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করলে তখনো তাদের জীবনধারণ করাটাই ছিল তাদের ধর্মের মূল বিধিবিধান।

ধর্মীয় ধারণাগুলোর প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েক হাজার বছর আগে মধ্য ও নিম্ন প্যালিলিথিক যুগে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রায় ৩০০,০০০ বছর আগে ধর্মীয় ধারণার

প্রমাণ হিসাবে হোমো স্যাপিয়েনদের কবরস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় ধারণার অন্যান্য প্রমাণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়, যার মধ্যে মধ্য পাথর যুগে হস্তনির্মিত বিভিন্ন প্রতীকী অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক, প্রাথমিক প্যালিলিথিক যুগের হস্তনির্মিত বিভিন্ন প্রতীকীর ব্যাখ্যা, যা কীভাবে ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কিত, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কিছুটা কম বিতর্কিত। বিজ্ঞানীরা সাধারণত ধর্মীয় ধারণার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে উর্ধ-প্যালোলিথিক (৫০,০০০-১৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) যুগ থেকে পাওয়া বেশ কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেই যুগের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর সাথে সম্পর্কিত উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে সিংহের মত দেখতে মানুষ, শুক্রের মূর্তি, চাউট গুহার সমাধি, গুহা চিত্র ইত্যাদি। যার সবগুলো ধারণা ছিলো কেবল মনগড়া গল্পের অনুশীলন।

উনিশ শতকের গবেষকগণ ধর্মের উৎস সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, যেটি খ্রিস্টান মতবাদকে বিতর্কিত করেছিলো।তারা উদারতার আগে দাবিগুলো চ্যালেঞ্জ করেছিল।বিভিন্ন গবেষক এবং গবেষক দের মতগুলো হলো:

১/ প্রারম্ভিক তত্ত্ববিদ **এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর** (১৮৩২-১৯১৭) এবং হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩) অ্যানিমিজমের ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন।

২/ প্রত্নতত্ত্ববিদ **জন লুবক** (১৮৩৪-১৯১৩) শব্দটিকে "প্রতিমাবাদ" বলেন।

৩/ ধর্মীয় পণ্ডিত **ম্যাক মুলার** (১৮২৩-১৯০০) বলেন ধর্ম শুরু হয় হেডোনিজম থেকে।

৪/ ফোকলোরিস্ট **উইলহেলম মানহার্ড** (১৯৩১-১৮৮০) বলেছিলেন, ধর্ম "প্রাকৃতিকতা" থেকে শুরু হয়েছিল, যার দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর পৌরাণিক ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এই সব তত্ত্বগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন বিস্তৃত ঐক্যমত্য নেই।

প্রাক-মৃৎপাত্র নিওলিথিক এ (পিপিএনএ) গোবেকলি তেপে, যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম ধর্মীয় স্থান। এর মধ্যে রয়েছে বিশাল টি-আকৃতির প্রস্তর স্তম্ভ, যা বিশ্বের প্রাচীনতম মেগালিথ হিসেবে পরিচিত। এটি বিমূর্ত চিত্র, চিত্রগ্রন্থ এবং পশু ভাস্কর্য ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত। এটি তথাকথিত নিউলিথিক বিপ্লবের আগে নির্মিত হয়েছিল, যেমনঃ ৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৃষি ও পশুপালন শুরু হয়েছিলো। কিন্তু গোবেকলি তেপের নির্মাণে একটি উন্নত সংগঠন বুঝায়, যা এখন পর্যন্ত প্যালিওলিথিক, পিপিএনএ বা পিপিএনবি সমাজগুলোর সাথে সম্পর্কিত নয়। জায়গাটি প্রথম কৃষি সমাজের শুরুতে প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে যায়। জায়গাটি এখনও খনন এবং বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এভাবে এই অঞ্চলের পুরনো সম্প্রদায়ের জন্য, সেইসাথে ধর্মের সাধারণ ইতিহাসের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে।

এই অংশটুকু ব্যাখা করে ধর্ম কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কেবল চোখে দেখা কয়েকটা স্তূপ অথবা মূর্তি কিংবা স্তম্ভ কে মেনে নিয়েছে যা নিয়ে ওই মুহূর্তে তারা কোনো ব্যাখ্যা পান নি।তবে কার্বন ডেটিং করে প্রত্নতত্ত্বের বয়স নির্ধারণের উপায় আবিষ্কারের পর এই সবগুলোর সৃষ্টি ইতিহাস জানা গিয়েছিলো যা কেবলমাত্র মানুষের সৃষ্টি ছিলো বিভিন্ন উপলক্ষ কেন্দ্র করে । কিন্তু তৎকালীন ওই সমাজের পূর্বে ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছিলো।তাই বলা যায় এই স্তূপ কিংবা মূর্তি ই প্রধান নয়।

ধর্মের উপকারিতা

সংগঠিত ধর্ম নিম্নলিখিত উপায়ে বৃহত্তর জনসংখ্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদানের মাধ্যম হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে।

ধর্ম হলো ঐশ্বরিক বাণী যার মধ্যে থাকবে সমস্ত জীবন বিধান।জীবনের সুসংগঠিত রীতি নীতি যাতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা থাকে তাকেই সাধারণ পরিভাষায় ধর্ম বলে।

সংগঠিত ধর্ম একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে ন্যায্যতা প্রদান করে, যার ফলে রাষ্ট্রকে সামাজিক ও নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদানের জন্য কর আদায় করার অধিকার লাভ করে। ভারত এবং মেসোপটেমিয়ার ধর্মশাসনে বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ,রাজা, এবং সম্রাট রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন। বিশ্বব্যাপী সমস্ত রাষ্ট্রীয় সমাজে অনুরূপ রাজনৈতিক কাঠামো রয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ঐশ্বরিক অনুমোদন দ্বারা ন্যায্যতা পায়।

সংগঠিত ধর্ম সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার উপায় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলো। তবে রাষ্ট্র ও দেশগুলোতে হাজার হাজার বা কোটি কোটি মানুষ পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন ছিলো। জারেড ডায়মন্ড যুক্তি দেখান যে, সংগঠিত ধর্ম অন্য কোনও সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধন তৈরী করে। অন্যথায় সেখানে শত্রুতার প্রবণতা প্রকাশ পাবে। কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দেন যে, ব্যান্ড ও উপজাতীয় সমাজের মধ্যে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হত্যাকাণ্ড।

[**তথ্যসূত্রঃ** Compare: Diamond, Jared। “chapter 14, From Egalitarianism to Kleptocracy”। Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societi]

মানবজীবনে ধর্মের গুরুত্ব, প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানবজীবনে ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. মানসিক শান্তি (Mental Peace) : মানুষের মানসিক প্রশান্তি লাভে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একমাত্র ধর্মই পারে মানসিক শান্তি আনতে। মুসলমানরা যখন মসজিদে অবস্থান করে, তখন তারা একটি বিশেষ শান্তি অনুভব করে।

মসজিদকে সব সময় একটি শীতল পবিত্র স্থান মনে হয়। ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মের লোকজন তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে শান্তি অনুভব করে।

২. জীবনের নিরাপত্তা বিধান (Safeguard of Life) : প্রত্যেক নাগরিকের কাছে তার নিজের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান। ধর্ম মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিটি ধর্মে অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে মহাপাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হত্যাকারীর জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডবিধান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রীতি ইসলাম ধর্মে দেওয়া হয়েছে যেন সামনে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পরিমাণ শূন্যের কাছে চলে আসে।এটি একটি দুর্দর্শি পরিকল্পনার অংশ।তবে কিছু ধর্মে এটা নাই বলে (কারণ সেগুলো গল্প) বর্তমান সময়ে খুন, রাহজানি,ধর্ষণ এর মতো ঘৃণ্য অপরাধ বাড়ছে।

৩. ঐক্য সাধন (Act of establishing Unity) : মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে ধর্ম ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য লক্ষ করা যায়।যদি কোনো ধর্মের লোক অন্য কোনো ধর্মের লোকের কাছে শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ধর্মের লোকজন একত্র হয়ে তাকে সাহায্য করে।

৪. সম্পদের নিরাপত্তা বিধান (Safeguard of Wealth) : জীবনের পরেই মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু সহায়-সম্পদ তথা ধন-সম্পদ। ধর্ম মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ধর্মে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, অর্থ আত্মসাৎ, লুণ্ঠন ও অবৈধ উপার্জন অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব কাজকর্মের জন্য শাস্তির বিধান আছে। অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে দখল বা আত্মসাৎ করাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে।

৫. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) : সমাজ পরিচালনার নানা বিষয়ে ধর্ম বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ধর্মের সঠিক ব্যবহারই সমাজকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৬. সম্মানের নিরাপত্তা বিধান (Safeguard of Prestige) : ধর্ম মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করে। কারণ মান-সম্ভ্রম মানুষের জীবন ও সম্পদের চেয়েও বেশি প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়। মানুষ তার ইজ্জত, সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে, জীবন উৎসর্গ করে। প্রতিটি ধর্মে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অহংকার করা, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা, ছোট করা বা অসম্মান করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা, মিথ্যা দোষারোপ, চোগলখুরি, কু-ধারণা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কারো সম্মানে আঘাত লাগে—এমন কথা বলা বা কাজ করা ইত্যাদিকে পরিহার করতে বলা হয়েছে।

৭. ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম (Religion in Personal Life) : ব্যক্তিগত জীবনকে সমাজসিদ্ধভাবে পরিচালনা করতে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ইসলাম মানুষকে সৎ, কর্মঠ, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল ও পরস্পরকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। ব্যক্তির স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, সৌন্দর্য, আহার-বিহার, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা, বিবেক-বুদ্ধি, অল্পে তুষ্টি, চারিত্রিক স্বচ্ছতা, কর্মোদ্যম, ধীরস্থিরতা, বিচক্ষণতা, বিনয় নম্রতা, ভদ্রতা, মহানুভবতা, সততা, নৈতিকতা, পরার্থপরতা, ভালো কাজ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় সব ধর্মে শিক্ষা দেওয়া হয়।তবে এই শিক্ষা যেন কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় এই শিক্ষা কেবল ইসলাম দিয়েছে।

৮. পারিবারিক জীবনে ধর্ম (Religion in Family Life) : পরিবার সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম আদিম সংগঠন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবারব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিবাহবন্ধন না থাকলে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা, অবাধ যৌনাচার, লিভ টুগেদার, সমকামিতা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, বিবাহের নামে অনেক স্ত্রী গ্রহণ প্রভৃতির দ্বারা মানবজাতি পাপপঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হতো। তাই বিবাহ একটি সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন

উপহার দেয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন মিলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। বিশ্বের সব ধর্মের মধ্যে ইসলাম পরিবারব্যবস্থাকে অটুট ও স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।হিন্দু ধর্মে যাদের কে স্রষ্টা জ্ঞান করা হয়ে থাকে তারা নিজেরাই ছিলো যৌনাচারে লিপ্ত।ভয়ংকর অসামাজিক কার্যকলাপের স্রষ্টা এবং অনুসারী।

৯. সামাজিক জীবনে ধর্ম (Religion in Social Life) : সমাজজীবনকে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সংহতি বিকাশে ধর্মের ভূমিকা অতুলনীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষ একত্র হয়ে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার করে। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মে মানবপ্রেম, মানবসেবা, পরার্থপরতা, দয়া, সহনশীলতা, সহযোগিতা, সদাচার প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়।

১০. রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম (Religion in State Life) : পৃথিবীর প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে ধর্মের ভূমিকা অনন্য। যে দেশে যে ধর্মের লোক বেশি, সাধারণত সেই ধর্মের লোকজন ক্ষমতায় আরোহণ করে। ধর্মের কারণেই রাষ্ট্র সুসংহত ও স্থায়ী হয়। তাই যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা যেন স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃত্ববাদী না হন, ধর্ম সেই শিক্ষাই দেয়। ধর্ম রাষ্ট্রের প্রধানকে প্রজাপালক, প্রজাকল্যাণকর ও জনদরদি হতে নির্দেশ দেয়। জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রতি ইসলাম ধর্মের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১১. আন্তর্জাতিক জীবনে ধর্ম (Religion in International Life) : বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পৃথিবীর সব মানুষ উৎসগত বিবেচনায় এক ও অভিন্ন। তাদের মা-বাবা এক, সৃষ্টিকর্তা এক এবং তাদের জীবনের উদ্ভব, বিকাশ ও গন্তব্য এক। ধর্ম একান্তভাবে বিশ্বমানবকে পারস্পরিক অভিন্নতার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

সোর্স:

১/"Religion – Definition of Religion by Merriam-Webster"

২/Morreall, John; Sonn, Tamara (২০১৩)। "Myth 1: All Societies Have Religions"। 50 Great Myths of Religion। Wiley-Blackwell। পৃষ্ঠা 12–17।

৩/Nongbri, Brent (২০১৩)। Before Religion: A History of a Modern Concept

৪/"Dharma", The Columbia Encyclopedia, 6th Ed. (2013), Columbia University Press, Gale,

৫/Steven Rosen (2006), Essential Hinduism, Praeger, Chapter 3.

৬/"Dharma | Encyclopedia.com"। The Oxford Dictionary of World Religions।

৭/Swindal, James (এপ্রিল ২০১০)। "Faith and Reason" (ইংরেজি ভাষায়)। Internet Encyclopedia of Philosophy

৮/African Studies Association; University of Michigan (২০০৫)। History in Africa। 32। পৃষ্ঠা 119

৯/"Religiously Unaffiliated",The Global Religious Landscape। Pew Research Center: Religion & Public Life। "The religiously unaffiliated include atheists, agnostics and people who do not identify with any particular religion in surveys. However, many of the religiously unaffiliated have some religious beliefs."

১০/Eileen Barker, 1999, "New Religious Movements: their incidence and significance", New Religious Movements: challenge and response, Bryan Wilson and Jamie Cresswell editors, Routledge.

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে মূলত দুটি ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। একটিকে বলা হয় বিশ্বাসভিত্তিক তত্ত্ব। এটি অনুমান করে যে ধর্মগুলি এক বা একাধিক দেবতা থেকে বা এই জাতীয় সর্বোত্তম সত্তার বা বিশ্বজনীন চেতনা বা সচেতনতার নবীদের (বার্তাবাহকদের) কাছ থেকে আসা ঐশ্বরিক বার্তার ফল। বিশ্বাসীরা স্বীকার করে যে তাদের ধর্ম দেবতা, দেবতা বা মহাজাগতিক থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্ঘাটন হিসাবে শুরু হয়েছিল। অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্ম, অধিকাংশ খ্রিস্টানদের দ্বারা অনুসরণ করা বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের সেট, বলে যে **যীশু খ্রিস্ট** (আনুমানিক 6 খ্রিস্টপূর্বাব্দ-সি. 30 CE) ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র উভয়ই ছিলেন(নাউজুবিল্লাহ) এই মতবাদ তাদের নিজেদের অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো। যীশু, একজন মানুষ, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছিল এবং তাঁর কথার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আওয়াজ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্ম, অন্যান্য সংগঠিত ধর্মের মতো, এর কেন্দ্রে রয়েছে নিয়ম এবং মতবাদগুলি অতিপ্রাকৃতভাবে অনুপ্রাণিত বলে বিশ্বাস করা হয়। এর মানে হল যে এই নিয়ম এবং মতবাদগুলি পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের বাইরে যা আছে সে সম্পর্কে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। কেউ কেউ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা করে, তবে প্রায়শই পৃথিবীতে এখানে অনুসরণ করার জন্য নিয়ম এবং নির্দেশিকা প্রদান করে, যেমন **দশটি আদেশ** । আদেশগুলি দশটি নিয়ম প্রদান করে যা ইহুদি এবং খ্রিস্টান উভয় ধর্মের অনুসারীদের অনুসরণ করতে বলা হয়।

ঈসা মসিহের মতো একটি ভূমিকা ইসলামে **হযরত মুহাম্মদ(স)** (সি. 570-632) গ্রহণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স)হলেন আল্লাহর সত্যিকারের নবী এবং রাসূল।   যার কাছে ফেরেশতা জিবরাইল (গ্যাব্রিয়েল) আল্লাহর ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। **বাহাউল্লাহ** (1817-1892) ছিলেন বাহাই বিশ্বাসের বার্তাবাহক, যেমনটি ইহুদি ধর্মের জন্য **মোজেস** (আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী) ছিলেন। এমনকি প্রাকৃতিক ধর্মেও, যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন থেকে বেড়ে ওঠে এবং ঐশ্বরিক বার্তাগুলির পরিবর্তে এটি যেভাবে কাজ

করে, যে সত্যগুলি পাওয়া যায় এবং বিকশিত হয় তা সর্বজনীন এবং চিরস্থায়ীভাবে বর্তমান বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে দর্শন-সদৃশ ধর্ম যেমন বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধ দ্বারা বিকশিত (সিদ্ধার্থ গৌতম [৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ])। বিশ্বাস-ভিত্তিক তত্ত্বে, মানবতা এমন একটি আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করে যা ইতিমধ্যেই কেবল ইসলাম ধর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০০০০ টি স্বতন্ত্র ধর্ম রয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধর্ম ব্যবস্থা হলো:

১/ইব্রাহামীয় ধর্মসমূহ

- ইসলাম
- খ্রিস্ট ধর্ম
- ইহুদি ধর্ম
- বাহাই ধর্ম
- দ্রুজ ধর্ম
- রাস্তাফারি ধর্ম
- ইয়াজিদি ধর্ম

২/ভারতীয় ধর্মসমূহ

- সনাতন বা হিন্দু ধর্ম
- জৈন ধর্ম
- বৌদ্ধধর্ম
- শিখ ধর্ম

৩/পূর্ব এশীয় ধর্মসমূহ

- তাও ধর্ম
- শিন্তো ধর্ম
- কনফুসীয় ধর্ম

- কোরীয় শামানবাদ
- মঙ্গোলীয় শামানবাদ

৪/পার্সি (ইরানীয়) ধর্মসমূহ

- জরথুস্ত্রবাদ
- মানি ধর্ম

৫/অন্যন্যা ধর্মসমূহ

- মেন্ডীয়বাদ
- বিভিন্ন লৌকিক ধর্মসমূহ

৬/বিলুপ্ত ধর্ম

- প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম
- সুমেরীয় ধর্ম
- ব্যবিলনীয় ধর্ম
- প্রাচীন গ্রিক ধর্ম
- রোমান ধর্ম
- মায়া ধর্ম
- ইনকা ধর্ম
- আজটেক ধর্ম

কিন্তু এই সকল ধর্মের উৎপত্তি এবং ধর্মীয় সঙ্গা থেকে এই ধারণা স্পষ্ট যে ইসলাম ব্যতীত বাকি সকল ধর্মেই বিকৃতি ঘটেছে এবং অধিকাংশ মানুষের মন গড়া গল্প কাহিনী।কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখেছি যে ধর্ম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।কিন্তু যদি যুগের সাথে কিংবা সময়ের সাথে নিজেদের প্রয়োজনে তা পরিবর্তন

করা যায় কিংবা করতেই হয় তাহলে তা কিভাবে ঐশ্বরিক বাণী হয়?? তা কিভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়??

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম (আরবি: الإسلام, আল-ইসলাম) একটি একেশ্বরবাদী এবং ইব্রাহিমীয় ধর্মবিশ্বাস যার মূল শিক্ষা হলো এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং মুহাম্মাদ(ﷺ)হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে প্রথম, যাকে বলা হয় শাহাদাহ। এটি পাঠের মাধ্যমে একজন স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ তার প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। সুরা ইখলাসে আল্লাহর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ۝

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

“ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। ”

— সূরা ইখলাস

এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম, যার অনুসারী এবং স্বীকৃতিদানকারীর সংখ্যা প্রায় ২০০কোটি (**তথ্যসূত্র:** "দেশ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা ২০২১"বিশ্ব জনসংখ্যা পর্যালোচনা।) যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় **২৪.৪%**। ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং স্বীকৃতিদানকারীরা মুসলিম এবং মুসলমান নামে পরিচিত। মুসলমানরা বিশ্বের ৫০ এর অধিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি গঠন করেছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো আল্লাহ দয়ালু, করুনাময়, এক ও অদ্বিতীয় এবং একমাত্র ইবাদতযোগ্য পমানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে-যুগে অনেক নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব এবং নিদর্শন পাঠিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো পবিত্র আল-কুরআন, যা স্বয়ং আল্লাহর বাণী; আর সর্বশেষ নবী **হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)** (২৯ আগস্ট ৫৭০- ৮ জুন ৬৩২) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে **সুন্নাহ** বলা হয় যা হাদিস নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে সমস্ত সুন্নাহই হাদিস, কিন্তু সমস্ত হাদিস সুন্নাহ নয়।

ইসলামী ধর্মগ্রন্থানুযায়ী, এটি আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। ইসলাম শুধুমাত্র মক্কা-মদিনা বা আরব দেশ ও জাতির জন্য নয় বরং ইসলাম বিশ্বের সকল বর্ণ, গোত্র, জাতি এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো ও আরব-অনারব সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত ও একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী, যুগে যুগে আদম, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা সহ সকল রাসূলগণের উপর যেসব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, মূল আরবি ভাষার **আল কুরআন** হলো তারই সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ, অপরিবর্তিত ও চূড়ান্ত সংস্করণ।**৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজ্বের** দিন এই জীবন ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে।

অন্যান্য ইব্রাহিমীয় ধর্মের মতো ইসলামও শেষবিচারের শিক্ষা দেয় যেখানে সৎকর্মশীলরা পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত পাবে আর পাপীরা জাহান্নামের শাস্তি পাবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, যা পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের

জন্য অত্যাবশকীয় কর্তব্য বা ফরজ। তাদেরকে ইসলামি আইন বা শরিয়াহ্ মেনে চলতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্র ও যাবতীয় কার্যকলাপকে নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাংক খাত থেকে দান-ছদকাহ্, নারী থেকে পরিবেশ সবই এর অন্তর্গত। **মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেম** ইসলামে সবচেয়ে সম্মানিত ও পবিত্রতম তিন শহর।

ইসলাম শুধুমাত্র কোন নতুন ধর্মই নয়, বরং সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামের উৎপত্তি। আদম(আ) ছিলেন এই পৃথিবীর প্রথম মানব এবং মানবজাতির মধ্যে ইসলামের প্রথম নবি। আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ), যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য সর্বেশষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে।

ইসলামের বুৎপত্তি

শাব্দিক ব্যাখ্যা: আরবি ভাষায়, ইসলাম (আরবি: ,إسلامl) হলো সক্রিয় কর্মধারক, যা স-ল-ম (S-L-M-[([س-ل-مত্রিশব্দী মূল থেকে উদ্ভূত, যা বেশিরভাগই জমা, নিরাপত্তা এবং শান্তির ধারণার সাথে সম্পর্কিত পদ গঠন করে।ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বোঝায়। ইসলামের অনুসারী মুসলমান ((مُسْلِمٌহলো একই ক্রিয়াপদ রূপের সক্রিয় কণা এবং এর অর্থ "আত্মসমর্পণকারী (আল্লাহর প্রতি)" বা "যে আত্মসমর্পণ করে (আল্লাহর প্রতি)")।

"মুসলিম" শব্দটি আরবি "মুসলিম" ((مسلمশব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ "আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী"। "মুসলিম" শব্দের সাথে ফারসি ") "انআন্) প্রত্যয় যুক্ত করে "মুসলমান" ((مسلمانশব্দটি গঠিত হয়েছে। যা একটি বহুবচন প্রত্যয়। অর্থাৎ, "মুসলমান" শব্দটি মূলত বহুবচন শব্দ। তবে বাংলায় এটি একবচনের মতো ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় "মুসলমান" শব্দটি দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।

আর, বহুবচনের জন্য "মুসলমানরা" (مسلمانانএটি ফারসী বহুবচন, - مُسْلِمُوْنَএটি আরবী বহুবচন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইতিহাসগতভাবে এর উৎপত্তি ধরা হয় ৭ম শতকের শুরুর দিকে মক্কায় নবী মুহাম্মাদের(ﷺ) নবুয়াতের পরবর্তী সময় থেকে। ৮ম শতক নাগাদ উমাইয়া খিলাফত পশ্চিমে ইবেরিয়া (স্পেন) থেকে পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে সম্প্রসারিত হয়। ৮ম থেকে ১৩ শতককে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামি **স্বর্ণযুগ** বলা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে মুসলিম বিশ্ব বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতির শীর্ষে ছিল। ইসলামের প্রসার ঘটেছে মূলত ধর্মপ্রচার এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে। রাজ্যজয়গুলো ঘটেছিল আলাদা আলাদা সম্রাজ্যের দ্বারা যেমন উসমানীয় সম্রাজ্য, আর ধর্মান্তরিতকরণ ঘটেছিল ইসলামি ধর্মপ্রচার কার্যক্রমের সাথে এবং নতুন নতুন রাজ্যজয়ের প্রভাবে।

মুসলিমরা **দুইটি** প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, **সুন্নি (৮০-৯০%)** এবং **শিয়া (১০-২০%)**। মূলত যারা শিয়া নয় তাদের সবাইকেই সুন্নি (মুসলিম) হিসেবে গণনা করা হয়। সুন্নি ইসলাম মূলত অনেকগুলো ইসলামী মতাদর্শের সমষ্টি। এছাড়াও কিছু মুসলিম নিজেদেরকে শিয়া সুন্নি কোনো দলেই ফেলেন না, তারা ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিভাজনে বিশ্বাসী না। তারা কুরআন এবং হাদিসকে মূল ধরে এগুলোর আলোকে (ইজমা ও কিয়াস) ইসলাম পালন করে এবং নিজেকে বিশুদ্ধ মুসলিম হিসেবে গড়ার চেষ্টা করে। তবে কুরআন এবং হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইজমা এবং কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয় বলে তারা বিশ্বাস করে। আর তারা মনে করে সকল মুসলিমের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের দ্বীন (মাযহাব) হিসেবে ইসলামকে স্বীকার করা এবং নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়া।

সর্ববৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ **ইন্দোনেশিয়া**, বিশ্বের সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার **১৩%**-ই এখানে বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার **৩১%**-ই বাস করেন **দক্ষিণ এশিয়ায়**, যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। **মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা** অঞ্চলে বাস করেন **২০%** এবং এটি এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ধর্ম। **১৫%** বাস করেন **সাহারা-নিম্ন আফ্রিকাতে**। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুসলিম সম্প্রদায় দেখা যায় আমেরিকা, ককেসাস, মধ্য এশিয়া, চীন, ইউরোপ, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াতে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা আমেরিকা, চীন এবং ইউরোপেও বসবাস করেন। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ধর্মান্তর ও উচ্চ জন্মহারের কারণে ইসলাম বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে, **২১শতাব্দীর শেষের দিকে ইসলাম খ্রিস্টধর্মকে ছাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মে পরিণত হতে পারে ইংশাআল্লাহ।**

মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ **আল কুরআন** নিখুঁত ও অবিকৃত এবং মানব ও জ্বীন জাতির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আল্লাহর সর্বশেষ বাণী, যা পুনরুত্থান দিবস বা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল ও কার্যকর থাকবে এবং এর কোনো অংশ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে কিছু সম্প্রদায়, যেমনঃ আহ্মদি বা কাদিয়ানী নামক সম্প্রদায় মনে করে মুহাম্মাদ শেষ নবী নন; বরং যুগের চাহিদা মোতাবেক নবুওয়াতের ধারা অব্যহত থাকবে যা মূল বিশ্বাস থেকে এর পরিপন্থী এবং ঈমান হারানোর সামিল। এরা মুশরিক বলে পরিগণিত হবেন। ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে অবশ্যই নবি মুহাম্মাদ এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবী। কুরআনের সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে,

اِنَّآ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ

“ আমি আপনাকে (মুহাম্মাদ) সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসেনি। ”

— সূরা ফাতির, আয়াত ২৪

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরাই হযরত ইব্রাহিম (আ.)এর শিক্ষার ঐতিহ্য পরম্পরা। উভয় ধর্মাবলম্বীকে কুরআনে ‘‘আহলে কিতাব’’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে । কুরআনের সূরা আলে ইমরানে তাদেরকে(খ্রিস্টানদের) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا
وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

“ বলুন (মুহাম্মাদ), ‘হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ‘ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। ”

— সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৬৪

এই ধর্ম দুটির গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ কুরআনেও রয়েছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। কারণ ঈসা (আ) এর প্রচারিত খ্রিস্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কে পরবর্তীতে পপ বা যাজক রা নিজেদের সুবিধা এবং খুশি মতো পরিবর্তন করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে এবং আসমানী বাণী হিসেবে আল কোরআন নাযিল হয়েছে। আল কোরআন নাযিল এর কথা তৎকালীন ঈসা (আ) এর উপর নাযিলকৃত বাইবেল এ ও ছিলো। ইহুদিরা তাওরাতকে (তোরাহ) ও খ্রিষ্টানরা ইনজিলকে বিকৃতকরে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছে।

কুরআন হলো ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ। এটি আল্লাহর দ্বারা প্রেরিত একটি ঐশ্বরিক বাণী যা মুহাম্মাদকে ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল। কুরআন আরবি ভাষায় নাযিলকৃত এবং এটি ইসলামের বিশ্বাস, আইন ও নৈতিকতার ভিত্তি। পবিত্র

কুরআনে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনিই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই এর সংরক্ষক। তিনি বলেন-

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

" নিশ্চয়ই আমিই এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষণকারী।"

— সূরা হিজর, আয়াত ৯

মুহাম্মাদ (ﷺ) ৪০ বছর বয়সে, এক রাতে মক্কার কাছে অবস্থিত হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। এই গুহাটি মক্কার উপরে একটি জাবালে নূর পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। মুহাম্মাদ(ﷺ) প্রায়ই এই গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন। জিব্রাইল(আ) ইসলামের একজন ফেরেশতা, মুহাম্মাদ(ﷺ) এর কাছে এসে তাকে নবুয়ত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। নবুয়ত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বার্তা প্রদান করার ক্ষমতা। জিব্রাইল(আ) মুহাম্মাদ (ﷺ) কে "**পড়ুন**!" বলেছিলেন। জিবরাইল (আ) এর আহ্বানের পরে, **কুরআনের প্রথম আয়াত, সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়**। এই আয়াতগুলোতে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বলছেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাকে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। কুরআনের সমগ্র অংশ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে দীর্ঘ সময় প্রায় **২৩** বছরেরও বেশি সময় ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই কারণে, মুহাম্মাদ (ﷺ) ধীরে ধীরে অন্যদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছাতে পারতেন। বেশিরভাগ ওহি (আয়াত), মুহাম্মাদ(ﷺ) যখন ধ্যান মগ্ন থাকতেন, তখন নাযিল হত। এই আয়াত নাযিল প্রক্রিয়া ৬১০ সালে শুরু হয়েছিল এবং ২২ বছর যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾
اِقْرَاْ وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ ۙ﴿۳﴾
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾

"   পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানত না।"

— সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত

ইসলামপূর্ব আরবরা ছিল পৌত্তলিক। ইসলামপূর্ব আরবরা নির্দিষ্ট পাহাড় এবং পর্বতগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে বিশেষভাবে পবিত্র মনে করত। উদাহরণস্বরূপ, তারা সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়কে হজযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে এই পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। কুরআন, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ, কিছু বহুঈশ্বরবাদী উপাসনালয়কে বাতিল করে দিয়েছে। এই উপাসনালয়গুলোতে, আরবরা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করত। কুরআন একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানায়। কুরআনে ধর্মীয় বিধিবিধান, সামাজিক বিধিনিষেধ, উপদেশ, উৎসাহ ও ভয়ভীতি এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবনী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এই বিষয়গুলো কুরআনের মূল বার্তাগুলোর মধ্যে রয়েছে। ইসলামের বিশ্বাস এবং শরিয়াতের মূল উৎস হলো কুরআন। কুরআন হলো ইসলামের প্রাথমিক উৎস, যা ইসলামের বিশ্বাস, অনুশীলন এবং আইনগুলোকে নির্ধারণ করে। কুরআনের শিক্ষাগুলো ইসলামের অনুসারীদের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে।

শরীয়াহ

শারিয়াহ বা শরিয়ত (আরবি: (شريعةহলো "ইসলামের আইন"। এটি ইসলাম ধর্মের প্রার্থনা, লেনদেন এবং শাস্তি সহ ধর্মীয় আইনের সমস্ত ধারণা এবং নিয়মগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

শরিয়ত ইসলামের ধর্মীয় আইন। এটি আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে তৈরি। শরিয়তের মূল উৎস হলো **কুরআন।** কুরআনে আল্লাহর নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞাগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই, কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তাই শরিয়তের আইন। শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো **হাদিস।** হাদিস হলো নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি। হাদিসগুলো কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাই, হাদিসগুলোও শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। **কিয়াস** হলো এক ধরনের যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, দুটি বিষয়ের মধ্যে একই কারণ (ইল্লত) থাকলে, সেই দুই বিষয়ের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে যে, শূকর খাওয়া হারাম। কারণ হলো, শূকর একটি অপবিত্র প্রাণী। এখন, যদি কোনো নতুন বিষয়ের সাথে শূকরের একই কারণ (অপবিত্রতা) থাকে, তাহলে সেই নতুন বিষয়টিও হারাম বলে বিবেচিত হবে। শাফিঈ এবং ইবনে কুদামাহর মতো কিছু ফকিহ মনে করেন যে, হারাম এবং হালাল খাবার নির্ধারণের জন্য আরবদের প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। এই মানদণ্ড অনুযায়ী, এমন খাবার যা আরবদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হালাল এবং যা অসঙ্গতিপূর্ণ তা হারাম।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশীয় ধর্ম বা জীবনধারা।এটি বিশ্বের **তৃতীয়** বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা **১২০** কোটিরও বেশি, বা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার **১৫-১৬%**, যারা হিন্দু নামে পরিচিত। হিন্দু শব্দটি একটি উচ্ছসিত, এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্ম হিসেবে দেখা হয় কারণ এটি মানুষের সৃষ্টি। অনেক অনুশীলনকারীই তাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম হিসাবে উল্লেখ করেন, যেমনটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধর্মের মূলে বেদ হওয়ায় এটি **'বৈদিক ধর্ম'** নামেও পরিচিত।

হিন্দুধর্ম হল বিভিন্ন দর্শন এবং ভাগ করা ধারণা, আচার, বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, তীর্থস্থান এবং ভাগ করা পাঠ্য উৎস দ্বারা চিহ্নিত একটি বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা যা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, পুরাণ, বৈদিক যজ্ঞ, যোগব্যায়াম, আগমিক আচার এবং মন্দির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে। যার সবটা ই লোক দেখানো এবং ঐশ্বরিক কোনো ক্ষমতা নেই।**ধর্মীয় আচারগুলো মূলত ধর্ম (নৈতিকতা), অর্থ (সমৃদ্ধি), কাম (আকাঙ্খা) ও মোক্ষ (ঈশ্বর প্রাপ্তি) এই চারটি অর্জনের লক্ষ্যে পালন করা হয়, যাকে একসাথে বলা হয় পুরুষার্থ; সেইসাথে আছে কর্ম এবং সংসার (মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্র)**। যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা, কীর্তন, ইষ্টনাম জপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দয়া, সংযম, ধৈর্য, প্রাণীর প্রতি অহিংসা ইত্যাদি চিরন্তন নৈতিক জীবনাচরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।তবে কাম বা অশ্লীলতা অনেক বেশি।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো শ্রুতি **("শোনা") এবং স্মৃতি ("স্মরণীয়")** প্রধানত দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

তাই লোকমুখে শোনা প্রতিটি গল্প কিংবা পৌরাণিক কাহিনী কে তারা স্মরণীয় করে রাখতে ধর্মের নাম দেয় যা উপরে আলোচনা করা ধর্মের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। **বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত,**

যার মধ্যে বেদ হচ্ছে সর্বপ্রধান, সর্বপ্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। আবার **ছয়টি আস্তিক দর্শন** রয়েছে যা বেদের স্বীকৃতি দেয়। যথা: **সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং ব্রহ্মসূত্র।** যদিও পুরাণকাল বিদ্যাশাস্ত্র হাজার বছরের একটি বংশানুক্রমিক উপস্থাপন করে, বৈদিক ঋষিদের থেকে শুরু করে, পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ব্রহ্মতান্ত্রিক অর্থোফ্রাক্সির সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষণ হিসাবে বিবেচনা করেন, যার বিভিন্ন শিকড় রয়েছে এবং **কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা নেই**।

বর্তমানে হিন্দুধর্মের **চারটি** বৃহত্তম সম্প্রদায় হল **বৈষ্ণবধর্ম**, **শৈবধর্ম**, **শাক্তধর্ম** এবং **স্মার্তবাদ।** হিন্দু গ্রন্থগুলিতে কর্তৃত্ব এবং চিরন্তন সত্যের উৎসগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে এই সত্যগুলির বোঝাপড়া আরও গভীর করতে এবং ঐতিহ্যকে আরও উন্নত করার জন্য কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার একটি শক্তিশালী হিন্দু ঐতিহ্যও রয়েছে। হিন্দু ধর্ম ভারত, নেপাল এবং মরিশাসের উপর সর্বাধিক স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিশ্বাস।

হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিশালত্ব।তাদের নির্দিষ্ট স্রষ্টা নেই।যেকোনো সৃষ্টি কেবল একজন সৃষ্টি করতে পারে।একাধিক জন স্রষ্টা হলে সেখানে ক্ষমতায়ন নিয়ে যুদ্ধ লেগে যেতো।কিন্তু পৌরাণিক গল্পের একজন নয় বরং একাধিক গল্পকার থাকে । বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়; দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ; জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, ত্রিয়া মার্গ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হিন্দুধর্মের বিশালত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাই হিন্দু ধর্মকে প্রায়শই একক ধর্মের পরিবর্তে ধর্মের পরিবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই ধর্মের পরিবারের প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলন ব্যবস্থা এবং পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। হিন্দু ধর্মে "**বিশ্বাস বা ধর্মের একীভূত বিশ্বাসের ঘোষিত কোন ব্যবস্থা নেই**", বরং এটি ভারতের ধর্মীয় বহুত্ববোধের বিশ্বাসের সমন্বিত একটি বিশাল শব্দ। **ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অনুসারে:**

"হিন্দু ধর্ম শব্দের একক সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যাটির আরেকটি অংশটি হ'ল হিন্দু ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠাতা নেই। এটি বিভিন্ন ঐতিহ্যের সংমিশ্রন যার মধ্যে রয়েছে "ব্রাহ্মণ্যিক অর্থোপ্রেসি, ত্যাগের ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয় বা স্থানীয় ঐতিহ্য"।

হিন্দু ধর্মের বুৎপত্তি

ঐতিহ্যগত ভাবে **হিন্দু ধর্ম; Sanatan Dharm** বা চিরস্থায়ী ধর্ম এবং **Arya Dharm** বা সুগুণাবলির ধর্ম নামে সুপরিচিত ছিল। হিন্দু শব্দটি ফার্সী Hindoostan হিন্দোস্তান (ফার্সি: (هندوستانনামের সাথে সম্পর্কিত। **হিন্দোস্তান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে হিন্দের স্থান বা ভূমি**। ঐতিহাসিক দের মতে, হিন্দু শব্দটি সিন্ধু শব্দের পরিবর্তিত রূপ। **১২ তম** শতাব্দীতে ফার্সী ভাষী তুর্কি আক্রমণ ও তদক্রম শাসন ব্যবস্থায় হিন্দোস্তান নামটির প্রসার ঘটে। বৃটিশ কলোনিয়াল সরকারের সময় Hinduism বা হিন্দুধর্ম নামে একটি একক ধর্মীয় পরিচয়ের বিস্তৃতি ঘটে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে । এটি **লৌহ** যুগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের বিকাশের সাথে মিলে যায়, এর কিছু ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম যেমন **ব্রোঞ্জ যুগের সিন্ধু উপত্যকা** সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত । হিন্দুধর্মকে এজন্য বিশ্বের "প্রাচীনতম ধর্ম" বলা হয়। পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভুত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হিসাবে মনে করেন, যার একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। এই হিন্দু সংমিশ্রণ **বৈদিক যুগের পরে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ – ২০০ এবং ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় নগরায়নের সময়কালে এবং হিন্দুধর্মের ধ্রুপদী যুগের শুরুর দিকে আবির্ভূত হয়, যখন মহাকাব্য এবং প্রথম পুরাণ রচিত হয়েছিল।**

৯ শতক থেকে ২১ শতক পর্যন্ত হিন্দু শিল্পকর্ম এবং মন্দির হিন্দুধর্মের ইতিহাস প্রায়শই বিকাশের সময়কালে বিভক্ত। প্রথম সময়কাল হল **প্রাক-বৈদিক যুগ**, যার মধ্যে সিন্ধু

উপত্যকা সভ্যতা এবং স্থানীয় প্রাক-ঐতিহাসিক ধর্ম রয়েছে, যা প্রায় ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শেষ হয় । খ্রিস্টপূর্ব **১৯০০** থেকে খ্রিস্টপূর্ব **১৪০০** এর মধ্যে কোনো সময়ে ইন্দো-আর্য অভিবাসনের সাথে ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মের প্রবর্তন শুরু হয় এবং উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের সূচনা হয়।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর ধীরে ধীরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলে বৈদিক ধর্মের নবজাগরণের রূপে ধ্রুপদি হিন্দুধর্মের উত্থান ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত – হিন্দু দর্শনের এই ছয়টি প্রধান শাখার উদ্ভব ঘটে । এই সময়টি হিন্দুধর্মের "**স্বর্ণযুগ**" বলে পরিচিত যা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়ীক। ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে একই সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদের মত একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে ।

মোটামুটিভাবে **৬৫০ থেকে ১১০০** খ্রিস্টাব্দের পর ধ্রুপদী পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে মধ্যযুগে। আদি শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদও এই সময় প্রচারিত হয়। উক্ত মতবাদ বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং স্মার্তধর্মের উত্থান ঘটায়। এর ফলে দর্শনের অবৈদান্তিক শাখাগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

১২০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দু ও ইসলামী উভয় শাসকের অধীনে হিন্দুধর্ম ভক্তি আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখা যায়, যা আজও প্রভাবশালী রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে যা আংশিকভাবে পশ্চিমা আন্দোলন, যেমন একতাবাদ এবং থিওসফি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীতে, ভারতীয় প্রবাসীদের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের পরম সংখ্যায় বৃহত্তম সম্প্রদায়ের সাথে সমস্ত মহাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা গঠিত হয়েছে।

হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের অধিকাংশেরই সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই সকল আন্দোলনে প্রাচীন উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের এক নূতনতর ব্যাখ্যা প্রদত্ত

হয় এবং মনোযোগ দেওয়া হয় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে। হিন্দু ধর্মের অনেক সাংঘর্ষিক বিষয় ছিলো ।হিন্দু একমাত্র ধর্ম যেখানে মানুষ মন খুশি মতো প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করতে পারে।হিন্দু ধর্মের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত।

তথ্যসূত্র:

১/Brodd, Jefferey (২০০৩), World Religions, Winona, MN: Saint Mary's Press

২/Among its roots are the Vedic religion of the late Vedic period and its emphasis on the status of Brahmans but also the religions of the Indus Valley civilisation the Sramana or renouncer traditions of east India and "popular or local traditions"

৩/Larson 1995

৪/Hiltebeitel 2007

৫/Osborne 2005

৬/Narayanan 2009

৭/Lockard 2007

৮/Blackwell's History of India: Stein 2002

৯/Some Aspects of Muslim Administration, Tripathi 1956

১০/Arya Name Meaning & Arya Family History at Ancestry

১১/Hastings, Warren (১৭৭৫)। CODE OF THE GENTOO LAWS, OR ORDINATIONS OF THE PUNDITS। London। পৃষ্ঠা xx–xxi

১২/Peter van der Veer, Hartmut Lehmann, Nation and religion: perspectives on Europe and Asia, Princeton University Press, 1999

নারী

নারী বলতে একজন পূর্ণ বয়স্ক মহিলা মানুষকে বোঝায়।যৌবনকালে পৌছাবার পূর্বে একজন নারীকে মেয়ে বলে সম্বোধন করা হয়।

সাধারণত, মহিলাদের দেহে দুটি X ক্রোমোজোম থাকে এবং তারা বয়ঃসন্ধি থেকে মেনোপজ পর্যন্ত গর্ভধারণ করতে এবং জন্ম দিতে সক্ষম। মহিলাদের শরীরকে পুরুষদের শরীর থেকে মহিলা প্রজনন ব্যবস্থা -এর মাধ্যমে আলাদা করা যায়। এবং শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

মেয়ে মানেই কোমল, নমনীয় একটি শরীর। এটা শুধুমাত্র কোনো ধারণা নয়, বাস্তবেও তাই। বিজ্ঞান বলছে, মূলত তিনটি বিষয়ের জন্য এমনটা হয়- জিন, হরমোন এবং জীবনযাপনের ধরন।পুরুষদের তুলনায় গড় উচ্চতা কম হয় এবং শরীররে পেশি কম থাকে।

মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রাধান্যের জন্য মেয়েদের ত্বক পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি তৈলাক্ত হয়। ত্বকের কোমলভাব অনেক বেশি থাকে। মেয়েদের কোমল শরীরের পেছনের মূল নিয়ামক কিন্তু জিন।

কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ভূমিকা পাল্টে যেতে থাকে। অত্যন্ত কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত হালকা বাড়ির কাজেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নারী শরীর। এ অভ্যাসই জিনবাহিত হয়েছে প্রায় দু’হাজার বছর ধরে। তাই

আদিম মানবীর জিনগঠনের সঙ্গে আধুনিক মানবীদের জিন গঠনে বহু পার্থক্য, বিশেষ করে শারীরিক কোমলতার নিরিখে।

পুরুষদের ব্রেন স্বাভাবিকভাবেই অঙ্ক কষতে পছন্দ করে। নারীরা পছন্দ করেন ভাষা।

পুরুষ আবেগ থেকে পেশী শক্তি এবং যুক্তি তর্ক বেশি পছন্দ করে।।

সাইকোলজি এবং নারীদের বাই ম্যাকাণিজম অফ বডি স্ট্রাকচার অনুসারে নারী শান্ত,শান্তি,আরামপ্রিয় এবং আহ্লাদী হয়।

তাই চাইলেই পুরুষদের সমান কাজ কিংবা পুরুষদের মতো কাজ করা সম্ভব না।দুইজন ই নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং গৌরবান্বিত।দুইজন কে এক করতে গিয়ে সমঅধিকার এর নামে নারীদের অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে যা একেবারেই কাম্য নয়।

নারীর মূল্যায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ

একুশ শতকে পদার্পণ করে বর্তমান বিশ্ব যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলে অংশ নিচ্ছে, নারী সেখানে এক অপরিহার্য অংশীদার। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে পিছিয়ে পড়া নারীর পক্ষে সেই প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নারী' হোক বা 'পুরুষ' হোক তাদের বড় পরিচয় হলো তারা মানুষ। নারীদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য, উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী প্রজন্মের ধারক।তাদের গর্বেই আসবে আগামী দিনের দেশ পরিচালকেরা।তাই শিক্ষা, জ্ঞান কিংবা মনুষ্যত্ব যদি কোনো মেয়ের উত্তম হয়,মা উত্তম আখলাকের হলে সন্তানের উপর এল্টার একটু ফলপ্রসূ প্রভাব পরে।একটি আদর্শ জাতির জন্য আদর্শ মা প্রয়োজন, চিরন্তন এ সত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না।   নারীর সম্মান এবং আখলাক সুরক্ষিত হলেই জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের বহুমাত্রিক সুযোগ-

সুবিধার চূড়ান্ত ব্যবহার করতে এবং এর অপব্যবহার রোধ করতে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে হবে এবং নারীকে প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।সমঅধিকার না বরং নারীর সম্মান তার চেয়ে বেশি। তবেই চেইন অনুসারে একটি উত্তম জাতি পাওয়া যাবে।নারীশিক্ষার প্রয়োজন যুগ যুগ ধরেই ছিল। দেশের সামাজিক, রাষ্টীয়, পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত উৎকর্যের সঙ্গে নারী শিক্ষার গুরুত্ব জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের লোক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠী যদি শিক্ষা গ্রহণ না করে, মনুষ্যত্নের গুণাবলি অর্জন না করে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা অনস্বীকার্য। পরিবার থেকে শুরু করে একটি সুন্দর শৃঙ্খলিত প্রজন্মের জন্য নারীকে অগ্রগণ্য ভাবতে হবে। শিক্ষিত,উত্তম আখলক এবং সম্মান প্রাপ্তা নারী তার সতীর্থ পুরুষকে এবং সন্তান কে নিজের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নারীকে তার যোগ্য সম্মান প্রাপ্য অধিকার না দিলে নারীদের প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণাগুণ বিকশিত হবে না এবং সামাজিক অনাচার ও পারিবারিক কলহ বাড়বে।

নারী আমাদের জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।তাই তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

নারীর অবমূল্যায়ন

দেশে-বিদেশে সাড়ম্বরে উদযাপিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস কি বিশ্বকে নতুন কোনো বার্তা দিতে পেরেছে, নাকি এটি ছিল একটি ‘গতানুগতিক উদযাপন’ যা কেবল ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে? ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করি না, তবে ‘হ্যাশট্যাগ মি টু’তে প্রতিফলিত নারী নিগ্রহের মাত্রা অথবা সম্প্রতি রাজধানীর রাজপথে প্রকাশ্যে একদল তরুণের নারী নিপীড়নের চিত্র এ বাস্তবতাই তুলে ধরছে- অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

দেখা যাচ্ছে- মেধা ও শ্রমে, আত্মত্যাগ আর বাৎসল্যে সমাজের চাকাকে সচল রাখতে পরোক্ষ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ্যে যে নারী অবদান রাখছে, তার সব গৌরব মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে শুধু নারী হয়ে জন্ম নেয়ার মূল ধারণার ভুল ব্যাখ্যার কারণে। নারীর জীবন ও মর্যাদা, তার মানবাধিকার পুরুষের সাথে তুলনা করতে করতে নারী তার নিজস্ব সম্মান এবং মূল্যবোধ হারাচ্ছে।

মূলত জন্মের পর থেকেই নারী অবমূল্যায়ন ও অমর্যাদার শিকার হয়। **হিন্দু শাস্ত্রকার মুনু বলে গেছেন- নারী কুমারীকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। নারী কখনই স্বাধীন থাকার উপযুক্ত নয়। খ্রিস্টান ধর্মাযাজক জন পলের বক্তব্য আরও ভয়াবহ- নারী পরাধীন থেকে নীরবে শিক্ষা লাভ করুক, তারা চুপচাপ থাকুক।**

কিন্তু তারা যে শেখাবে অথবা পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করবে আমি তা সহ্য করব না। **চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস নারীকে দেখেছেন দেহসর্বস্ব এক প্রাণীরূপে। তার মতে- নারীর কোনো আত্মা নেই, নারী কেবলই এক দেহমাত্র। আর গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তুষ্ট থেকেছেন এই বলে- ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে এথেন্সবাসী করেছেন; বর্বর করেননি। ক্রীতদাস বা স্ত্রীলোক করেননি।**

প্লেটো থেকে আজ পর্যন্ত, মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। কিন্তু নারী সম্পর্কে সমাজ যে এখনও নেতিবাচক ধারণাই পোষণ করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে **মুম্বাইয়ের ক্লিনিকগুলোয় পুত্র সন্তানের আশায় ৯৫.৫ ভাগ কন্যা-ভ্রূণ হত্যার ঘটনা** থেকে। এই বাস্তবতা আমাদের নিয়ে যায় ওই সময়টিতে- যখন বিশ্বের সমগ্র মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলজুড়ে জন্ম নেয়া মাত্র কন্যাশিশুকে হত্যার বীভৎস প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল।

ব্রিটিশ শাসনামলে কন্যাশিশু হত্যার প্রথা বিলোপ করার আগে **ভারতে এই পৈশাচিকতা প্রায় পাঁচশ' বছর** ধরে চলে আসছিল। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর ব্রিটিশ সরকার ১৯০৬ সালের দিকে কন্যাশিশু হত্যার মতো নির্মম প্রথার পুরোপুরি অবসান ঘটালেও বর্তমানে অন্যভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় এই ভারতেই কন্যাশিশু হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। **টাইমস অব ইন্ডিয়া জানাচ্ছে- লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছরে ভারতে ৭৮ হাজার কন্যা-ভ্রূণের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে সুপরিকল্পিত গর্ভপাতের মাধ্যমে।**

দাস প্রথা অবসানের সুদীর্ঘকাল পরও অনেক সমাজ মেয়েদের প্রতি এমন আচরণ করে থাকে, যেন তারা ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি। তাদের বেড়ি হচ্ছে নগণ্য শিক্ষা, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, সীমিত রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সীমিত সুযোগ, কঠোর সামাজিক প্রথা ও আইনের চোখে অসমতা।

আর নারীদের হাতে-পায়ে এসব বেড়ি পরিয়ে রাখার জন্য সহিংসতাকে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার দ্বার অর্গলমুক্ত রাখার ব্যাপারটি যেন এমন একটি বিশাল কালো প্রকোষ্ঠের চৌকাঠে দাঁড়ানো- যার ভেতরটা সম্মিলিত যন্ত্রণায় প্রকম্পিত হচ্ছে। এই যন্ত্রণা যে কতটা প্রকট, তা উপলব্ধি করতে এই পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখা যেতে পারে- যেখানে **বিশ্বে প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন, প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন নারী শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন।**

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় নারীর প্রতি সহিংস আচরণের বেশিরভাগই সামাজিক বিন্যাসের ধারা হিসেবে স্বীকৃত ও সমর্থিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেক দেশেই বউ পেটানোকে একটি স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়- যা পুরুষোচিত বিশেষ অধিকার হিসেবে গান, প্রবাদ ও বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোয় সোল্লাসে বর্ণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের

মতো শিল্পোন্নত সমাজে, যেখানে ইতিপূর্বে নারী নির্যাতনের বিষয়টির প্রতি ভ্রূকুটি করা হয়েছে, সেখানে নারী নির্যাতনের সত্যিকার চিত্র সরকারি ঘোষণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে।

দেশটিতে **প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হচ্ছেন, যারা প্রতি ৫ জন পূর্ণবয়স্ক নারীর একজন**। এছাড়া সেখানে **প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন**। **মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশের আদালতে 'পারিবারিক সম্মান রক্ষা'র বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে- যেখানে কোনো নারীকে খুন করার পর সেই খুনের শাস্তি থেকে পিতা বা স্বামীর অনায়াসে রেহাই পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।**

লাতিন আমেরিকার অন্তত ১২টি দেশে ধর্ষিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে এবং সে তাতে সম্মত হলে ধর্ষণকারীকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া হয়। নারীর চেহারা বিকৃত করার জন্য বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ এমন সচরাচর ঘটনা যে, এজন্য দণ্ডবিধিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে এটি সংযোজন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বেদনাদায়ক হল- নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অপরাধী শুধু যে শাস্তি এড়িয়ে যায়, তা নয়; বরং তা নীরবে সহ্যও করা হয়। এ নীরবতা নির্যাতিতার, এ নীরবতা সমাজের।

অভিনব মনে হতে পারে, তবে এটাই বাস্তবতা- লাখ লাখ নারীর জন্য গৃহ হচ্ছে একটি ত্রাসের কেন্দ্র। নারীরা অপরিচিতজনের হামলাকে যতটা না ভয় পায়, তারচেয়ে বেশি ভয় পায় আত্মীয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রেমিকের নৃশংসতাকে। ঘরের ভেতরে সংঘটিত শারীরিক নির্যাতন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সবচেয়ে সার্বজনীন একটি ধরন এবং প্রজনন বয়সী নারীর জখম হওয়ার তা প্রধান কারণ। অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে

দেখা গেছে, বেশির ভাগ ধর্ষিতা অপরাধীদের চেনেন, যেমন **খুন হওয়া অন্তত ৪০ ভাগ নারী তাদের চেনাজানা লোকের হাতে নিহত হন।**

বস্তুতপক্ষে পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে শিক্ষা, শ্রেণী, আয় ও জাতিগত সীমানা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পরিচালিত একটি জরিপ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে- নারীদের এক-চতুর্থাংশ থেকে প্রায় অর্ধেক অন্তরঙ্গ সঙ্গীর হাতে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করেছে। দেশে দেশে সঠিক তুলনামূলক বিচার করার মতো যথেষ্ট উপাত্ত এখন পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও পারিবারিক সহিংসতার বিদ্যমানতা এবং এর ধরন এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল সমাজে ধর্ষণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত উপাত্তের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক মানদণ্ডের বিচারে ভিন্ন এই দুই সমাজের নারীরা একই ধরনের নিয়তির মুখোমুখি হচ্ছে। আর বেশিরভাগ দেশের আইনই পারিবারিক গণ্ডির ভেতরের হামলা সম্পর্কে নীরব।

নারীকে শৃঙ্খলিত করতে দাসত্ব থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক ঘৃণ্য প্রথার যথার্থতা প্রমাণে সংস্কৃতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। দারিদ্র্য, বৈষম্য, অজ্ঞতা ও সামাজিক অস্থিরতা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সাধারণ পূর্বাভাস। নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার ঘোরতর শত্রু হল, পূত-পবিত্র ঐতিহ্যের নামে প্রচলিত সাংস্কৃতিক শক্তি। **আফ্রিকায় বছরে প্রায় ২০ লাখ মেয়ের যৌনাঙ্গছেদের ঘটনাটিকে এই প্রথার সমর্থক যারা এবং যাদের অনেকেই নারী- এটিকে ঐতিহ্যগত 'সাংস্কৃতিক রেওয়াজ' হিসেবে দেখে থাকেন, যেখানে অন্যদের 'মাথা ঘামানোর' কিছু নেই।**

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি মানবাধিকারের গুরুতর লংঘন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি অভিশাপ- যা সবরকম সাংস্কৃতিক সীমা অতিক্রম করেছে। ঐতিহ্য **'যৌতুকের বলি'** প্রথারও রসদ জোগায়, যে প্রথায় একজন নারীকে শ্বশুরপক্ষের যৌতুকের দাবি

মেটানোর অপারগতার কারণে হত্যা পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। **ভারতে এ ধরনের বিরোধের ফলে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ জন নারী প্রাণ হারান** এবং এসব মৃত্যুর বেশির ভাগ ঘটে রান্নাঘরের আগুনে, যাতে এটিকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবে সাজানো যায়। **'পুত্রের প্রত্যাশা' নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত আরেকটি অশুভ চিন্তা**। বিশ্বের অনেক স্থানের মতো আফ্রিকায় একজন মহিলা তিন ছেলের জননী হলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন এবং প্রশংসা লাভ করেন। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী তিন কন্যার জননী হন করুণার পাত্রী।

ঐতিহ্যগতভাবেই প্রায় ক্ষেত্রে নারীরা সবার শেষে খাবার খান এবং অল্প খান। নারীদের শেখানো হয়- যদি তারা অন্যের কাছে ভালো থাকতে চান এবং ভালো ব্যবহার আশা করেন, তাহলে সবার আগে 'অন্যের প্রয়োজন' বিবেচনা করতে হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এমন সব অসুবিধা তারা নিঃশব্দে মেনে নেন, পুরুষের ক্ষেত্রে যেগুলো নিয়ে হৈ চৈ করা হয় এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কোনো নারী গুরুতর অসুস্থ হলেও তার কাছে 'কাজ' প্রত্যাশা করা হয়, আর কোনো ছেলের মাথাব্যথা হলে তাকে বলা হয় শুয়ে থাকতে এবং আশা করা হয়, নারী তার যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ ধৈর্য সহকারে সয়ে যাবেন। বস্তুত নারীকে এটাই শেখানো হয়- যত বেশি দুর্ভোগ তিনি সইতে পারবেন, তার প্রশংসাও হবে ততো বেশি।

আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে এক সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ক্রমবর্ধমান নিত্যদিনকার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, বলপূর্বক অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত করানো এবং অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ প্রতিনিয়ত ঘটছে। জনগণ নিজ নিজ পরিবারের মেয়েদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ঘরে বা ঘরের বাইরে নারী নির্যাতন, ভীতি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাসময়ে যথোপযুক্ত বিচার না হওয়ায় মহিলাদের জীবন অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে এবং এই ভীতি নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে। পরিণতিতে

জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টাও সামগ্রিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নির্যাতন ও হয়রানির ভয় নারীদের সামগ্রিক গতিশীলতার পথে একটি স্থায়ী বাধা। এ বাধা উন্নয়ন ও মূল কর্মধারার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে তোলে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ১৯৭২ সালে নবগঠিত বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে তদানীন্তন সরকার নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এটিকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশুবিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাবিষয়ক অধিদফতর এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নারী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নারী অধিকার ও উন্নয়ন আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কনভেনশনে অংশগ্রহণ ও সমর্থন প্রদান করেছে।

নারীর নিরাপত্তাহীনতা প্রতিটি সংস্কৃতিতে একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।নারী নিপীড়নের বিষয়টি যে পরিবর্তনের অতীত- তা নয়। জাতিগত বিদ্বেষের মতোই এটি ক্ষমতার একটি প্রয়োগ, যা পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু এটি এতকাল ধরে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, তাই এসব সামাজিক কাঠামো ভাঙতে হলে সৃজনশীলতা, ধৈর্য এবং নানাদিক থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা বলছে- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করতে হলে শুধু আলাদা আলাদাভাবে সহিংস কাজের জন্য শাস্তির বিধান করলেই চলবে না; বরং এই ধারণাটির পরিবর্তন করতে হবে- নারীর মূল্য পুরুষের চেয়ে কম। পুরুষের ন্যায় একইরকম শক্তিশালী ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসেবে সমাজে নারীর অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে তবেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে এটিকে একটি 'দুঃখজনক বিচ্যুতি' হিসেবে ভাবতে পারব।

কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পথ-ঘাট এমনকি নিজের পরিবারেও নারীরা নিরাপদ নয়। বিচার ব্যবস্থায় অসঙ্গতি, ক্ষমতা, দুর্নীতি, ন্যায় বিচারের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে প্রতিনিয়ত বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে নারীকে।

এক রিপোর্টে দেখা গেছে- চলতি বছরের প্রথম চার মাসেই দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৮৭ জন নারী ও শিশু। নির্যাতিত হয়েছে আরও ৮১ জন শিশু। গণপরিবহনগুলোতে নারীর যাতায়াত রীতিমত আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিচারব্যবস্থা বারবার আমাদের হতাশ করছে। কারণ অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে তারা ক্ষমতার জোরে বিচারের ঊর্ধ্বে থেকে যাচ্ছে। একটি ঘটনা সাময়িকভাবে ব্যাপক আলোচিত হলেও কিছুদিন পর তা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। ফলে বিচার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। বিচারহীনতা নারীকে আরও বেশি অনিরাপদ করেছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতি থেকে যদি বেরিয়ে আসা না যায় তবে নারীর উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

একটি সামান্য পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দীর্ঘতম যাত্রাটির সূচনা হয় বলে প্রাচীন যে প্রবাদ রয়েছে- নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান ঘটাতে বিশ্বের প্রতিটি সমাজের প্রতিটি খাতে যেমন বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষ, রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং অবশ্যই ব্যক্তি নারী ও পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

এটি আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত- নারী উন্নয়নে বিনিয়োগ মূলত সমগ্র দেশের জন্যই উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নততর স্বাস্থ্য এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত করে। তাই নারীকে পশ্চাতে রেখে, নারীকে অন্ধকারে রেখে কোনো জাতির পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন-চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব নয়। নারীকে নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগীর ভূমিকায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আজ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে- প্রথমত এবং প্রধানত নারী একজন মানুষ, যেমন মানুষ একজন পুরুষ। কেবল এই সত্য, এই বাস্তবতা অনুধাবনের মধ্য দিয়েই এমন এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার বিনির্মাণ সম্ভব- যার স্বপ্ন দেখে এই দেশের, এই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, **Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'**।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, **'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'**।তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। **সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।**

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। **আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়।** পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর মুল্যায়ন

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে

এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের ব্যাপারে মূল্যায়ন করা হয়নি, এব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানী হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হ'তে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট! (নাহল ৫৮-৫৯)

তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، '

আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (তাকভীর ৮-৯)।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। **সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত।**

এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে **আল্লাহ তা'আলা** এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، '

আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' (নূর ৩৩)

উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা নারীদের মর্যাদা দেয় নি। অমুসলিমরাও নারীদের মূল্যায়ন করেনি।

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন

ভূমিকা:

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আলে ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক

এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' (নিসা ১)।

মানুষ সামাজিক জীব, অন্যদিকে প্রকৃতির অংশ। তাই মানুষকে জীবন ধারণ, বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় বিধানই মেনে চলতে হবে। প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য। আর সামাজিক বিধান ভঙ্গ করলে নেমে আসে বিপর্যয়। সামাজিক নিয়মগুলো প্রকৃতি থেকে মানুষের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠে। বিধানসমূহের মধ্যে ধর্মীয় বিধানই শ্রেয়।

ইসলামের মহাগ্রন্থ আল কোরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটির ২৬ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কোরআনে 'নিসা' তথা 'মহিলা' শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। এ ছাড়া কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জান-মালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ-

'যে ব্যক্তি তিন জন মেয়েকে লালন-পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে' (আহমাদ হা/১১৮৬৩)।

ইহুদী-খৃষ্টান নারীদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং উপভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে। নারীরা ঋতুবতী হলে তারা তাদেরকে ঘৃণা করে।

عَنْ أَنَسٍ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ).

আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোন স্ত্রীলোক হায়েযগ্রস্তা হত তখন তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সঙ্গে রাখত না। একবার নবী করীম(সা.) -কে তারা (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)। অত্র হাদীছে নারীদের সাথে ইহুদী-নাছারাদের আচরণ প্রমাণিত হয়, যা খুব দুঃখজনক।

পক্ষামত্মরে নবী কারীম (ছাঃ) ঋতুবতী নারীদের সাথে যে আচরণ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি আর নবী একই পাত্র হতে গোসল করতাম, অথচ তখন আমরা উভয়ে নাপাক। আমি তাঁর আদেশক্রমে লজ্জাস্থানের উপর লুঙ্গী বা কাপড় বাঁধতাম, তারপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন অথবা আমার সাথে শুইতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। তিনি ই'তেকাফ অবস্থায় আমার দিকে

মাথা বের করে দিতেন। আমি মাথা ধুয়ে দিতাম, অথচ আমি ঋতুবতী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

আয়েশা (রা) বলেন, ‘আমি ঋতু অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর রাসূল(সা.) -কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। আর কখনও আমি ঋতু অবস্থায় হাড়ের মাংস খেতাম। অতঃপর তা আমি তাকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে খেতেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭)।

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

আয়েশা (রা) বলেন, ‘নবী(সা.) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পড়তেন, অথচ আমি ঋতুবতী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

আয়েশা (রা) বলেন, নবী(সা.) একদা আমাকে বললেন, ‘মসজিদ হ’তে মাদুরটি দাও! আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। রাসূল(সা.) বললেন, তোমার ঋতু তোমার হাতে লেগে নেই (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯)।

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنا حَائِض.

মায়মুনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)ছালাত পড়তেন একটি চাদরে, যার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর, অথচ তখন আমি ঋতুবতী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০)।

অত্র বিবরণে বুঝা যায় আল্লাহর নবী নারীদের কেমন মর্যাদা দিতেন। **ঋতু অবস্থায় ইহুদীরা নারীদের ঘৃণা করে। আর এসময় আল্লাহর নবী স্ত্রীর উরুর উপর মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করেন।**

প্রত্যেকটি জিনিসের ভাল ও মন্দ গুণাগুণ রয়েছে। এই গুণাগুণগুলিকে সে জিনিসের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উত্তম আদর্শ রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّمَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّلِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْابَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخَوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَا غَيْرِاُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَتِ النَّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّط وَتُوْبُوْآاِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

‘আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়নাকে তাদের বুকের উপর দিয়ে পেচিয়ে রাখে’ তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ **(নূর ৩১)।**

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ‘

তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না’ (আহযাব ৩৩)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَلْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ‘

লজ্জা হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম’ (মিশকাত হা/৫০৭৭)।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে নিজ গৃহেই অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজন বশত যদি তাদেরকে বাইরে যেতেই হয় তাহ’লে তাদেরকে

পূর্ণ পর্দা করে যেতে হবে। মূলতঃ পর্দাই হচ্ছে মহিলাদের জন্য এক শ্রেষ্ঠ গুণ। কারণ যাদের পর্দা নেই তাদের লজ্জা-শরম নেই। আর যাদের লজ্জা নেই ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ভালবাসা তাদের নিকট হ'তে দূরে সরে যায়। তাই প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য কুরআন-হাদীছ অনুসারে পর্দা করা যরূরী এবং লোক দেখানো পর্দা পরিহার করা আবশ্যক।এতে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে হেফাজত করা যায়।এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)।

এতে প্রমাণিত হয় নারীদের সৌন্দর্য নিয়েও ইসলাম সুন্দর অবস্থানে রয়েছেন।যে যেমন সৃষ্টি তাকে সেভাবেই সুন্দর বলা হয়েছে এবং সেটা পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছে।এতে করে পার্লার এর পেছনে টাকা,নিজেকে নিয়ে হীন মানসিকতায় থাকা টা বন্ধ হয়েছে।ইসলাম প্রত্যেককে সম্মান করে এবং ভালোবাসে।

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে।জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের কে বিচরণের অধিকার দিয়েছে।প্রাক-ইসলামিক যুগে কন্যাসন্তানদের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। কন্যাসন্তানদের পিতা হওয়াকে অপমানজনক মনে করা হতো। কারো কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সে খুবই মর্মাহত হতো; এমনকি কেউ কেউ তাকে হত্যাও করে ফেলত। এ অবস্থায় আরবের বর্বরতার অন্ধকার যুগের নারীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করে ইসলাম যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করেছে তা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

নারীর শিক্ষা

ইসলামধর্মে জ্ঞানার্জনকে অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নারীদের তালিম তালবিয়ার ব্যাপারে **পবিত্র কোরআনে** আছে,

‘তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।’ (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)।

মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, **‘যার রয়েছে কন্যাসন্তান, সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’**

তিনি আরও বলেন,

‘তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।’

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

‘ইলম শিক্ষা করা (জ্ঞানার্জন করা) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ (কর্তব্য)।’ (উম্মুস সহিহাঈন-ইবনে মাজাহ শরিফ)।

তাই হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে **হজরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২ হাজার ২১০, যা সব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিতীয়।**

কোরআন শরিফের **সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের শুভ সূচনা।**

জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে কোরআন শরিফে আরো বলা হয়েছে, **‘যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (জ্ঞানী নয়) তারা কি সমান?’ (সুরা জুমার, আয়াত : ৯)**

মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করার জন্য হাদিসে শুধু খুব উৎসাহই প্রদান করা নয়, অবশ্য কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।' **(ইবনে মাজাহ)**

অর্থাৎ পুরুষের যেমন শিক্ষার অধিকার আছে, তেমনি নারীরও শিক্ষার অধিকার আছে, যা উভয়ের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

নারীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা

একইভাবে আধ্যাত্মিক মহিমা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীর কর্তব্য রয়েছে।

কোরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

'এ কথা সুনিশ্চিত, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের সম্ভ্রমের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' **(সূরা-২২ আহজাব, আয়াত: ৩৫)**।

মা হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে।

মহানবী (সা.) বলেন,

‘মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত’

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক **মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)**-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

“আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, ‘তোমার মা’। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন ‘তোমার মা’। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন ‘তোমার মা’”। (বুখারি)।

মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে **হজরত ওয়াইস করনি (রা.)** প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি।

একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ, এখন আমি কী করতে পারি?’ নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, ‘আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি।’

নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে। **জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে**। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।

কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, **‘আর ইবাদত করো আল্লাহর, শরিক করো না তার সঙ্গে অন্য কাউকে, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ও সদয় ব্যবহার কোরো।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬)**

ইসলামবিরোধী পিতা-মাতার ব্যাপারেও সন্তানের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক বলেন, 'যদি তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে তোমাকে ওই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে তুমি আমার সঙ্গে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দুজনের (কারোরই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।' (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৫)

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন,

'মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।'

হাদিস শরিফে আরও আছে,

'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।'

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করত। ইসলাম সন্তান হত্যা হারাম ঘোষণা করে পুত্র-কন্যাদের এ থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে।

কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না; তাদের এবং তোমাদেরও আমি রিজিক (আহার) প্রদান করি। তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩১)

বোন হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, **'কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে।'**

হাদিস শরিফে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য। দুরুদ ও সালাম জানাই মানবতার মুক্তির দিশারী, সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক এবং নারী জাতির মুক্তির ত্রাণ কর্তা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উপর যিনি পৃথিবীকে ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করে হিদয়াতী নূরের আলোতে উজ্জ্বল করে উসওয়াতুন হাসানার মাধ্যমে বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং চরমভাবে নির্যাতিত মানবতার মুক্তি সাধন করে জগতে সত্যিকার মানবতা কায়েম করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। নারী জাতি সর্ম্পকে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর অমিয় শ্বাশতবাণী **"নারী জাতি সমাজেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ"**। নারীরা সৃষ্টি জগতের জন্য মহান আল্লাহপাকের এক অনুপম এবং অতুলনীয় সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টিতে নর এবং নারী একে অন্যের পরিপূরক। ইসলামের দৃষ্টিতে নর এবং নারীর স্থায়িত্ব এবং শান্তি তাদের পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সৌহাদ্যপূর্ণ সর্ম্পকের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। একটি সফল বিয়ের মাধ্যমেই একজন নারী স্ত্রী হিসেবে স্বামীর গৃহে আগমন করে স্বামীর মনোরাজ্যে স্থাপন করে স্বীয় সিংহাসন এবং বিচরণ করে তার আপন রাজত্বে। কেননা নারীরা মৃত মনে নব জীবনের স্পন্দন জাগায় সতত সর্বত্র।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মানসে জাগায় আশার আলো। বিপদে ঝঞ্ঝা বাত্যায় বৃক্ষের কচি শাখার মতই থাকে সে অটুট, স্থায়ী। সামান্য আনন্দেই নারীর বদনে খেলে হাসির উদ্বেল লহরী। নারীরা স্বামীর জীবনের আবাহন, পুলকের সঙ্গিত, পবিত্র সঙ্গী, মমতার প্রতীক

প্রতিমূর্তি। তারা বিশ্ব নিখিলের প্রাণ সম্পদ। নিখিলের ছবিতে যা কিছু চাকচিক্য তা সবই এ নারীর কল্যাণেই। গোটা বিশ্ব মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। সৃষ্টি জগতের যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর সেখানেই নারীরা আছে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে। বন্ধুত্ব, প্রেম প্রীতি, পবিত্রতা, সতিত্ব আত্মদান হচ্ছে এ নারীর ভূষণ বৈশিষ্ট্য। অনন্ত কাল পর্যন্ত নারীর এ ভূষণ স্থায়ী থাকবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পৃথিবীতে এ নারী সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজের সর্বক্ষেত্রে চরমভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত হয়ে জগতে মানবেতর জীবন- যাপন করে আসছে। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে যারা বর্তমানে নিজেদেরকে সভ্যদার দাবিদার বলে জাহির করে তারা নারীদেরকে সকল পাপ কর্মের প্রধান উৎস বলে মনে করে। নারীরা জীবনের সর্বত্রই অবহেলার এবং ঘৃণার পাত্রী হিসেবে স্বীকৃ্ৃত ছিল। দাসী এবং স্ত্রীদের মধ্যে সামাজিকতার কোন পার্থক্য ছিল না। তারা ছিল একে অন্যের পরিপূরক।

স্ত্রী'রা নগন্য জীব এবং দয়ার পাত্রী হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিল। বৈবাহিক জীবনে স্ত্রী'রা ছিল চরমভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। জাহিলিয়া যুগে একজন পুরুষ একসাথে অনেক নারীর সাথে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হতে পারত। পুরুষরা তাদের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী গ্রহণ এবং বর্জন করতে পারত। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোন বাধা ধরা নিয়ম ছিল না। সামাজিক মূল্যবোধ, সম্মানবোধ বলতে স্ত্রীদের কিছুই ছিল না। প্রতিবাদ করার কোন ভাষাও তাদের ছিল না। সন্তান উৎপাদন এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। পিতা মারা যাওয়ার পর বড় ছেলে সৎ মায়ের বৈধ উত্তরাধিকারী হওয়ার ন্যায় নেক্কার জনক রীতিনীতি আরবে বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া অর্থনৈতিক ভাবে স্ত্রীরা ছিল শোষিত, বঞ্চিত। তাদের মীরাসে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। বরং তারা নিজেরাই মীরাসের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পরিত্যক্ত মাল, সম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। তাদেরকে পরিবারের নিকট আটকে রেখে স্বামীরা তাদের নিকট থেকে তাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেবার নানাহ চেষ্টা এবং বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করত।

মানবতার ধর্ম ইসলাম স্ত্রী জাতির এ চরম অবমাননাকর, ঘৃনীত রীতি চিরতরে বন্ধ করে তাদেরকে মীরাসের অংশীদার নির্ধারণ করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় এরশাদ করেন “তোমরা হে স্বামীরা!

তাদের (স্ত্রী) দের বেঁধে আটকে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া ধন সম্পত্তির কিছু অংশ কেড়ে নেবে”। ইসলাম নারীদেরকে স্ত্রী হিসেবে যে তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া ধন সম্পত্তির কিছু অংশ কেড়ে নেবে”। ইসলাম নারীদেরকে স্ত্রী হিসেবে যে সম্মান এবং মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা পৃথিবীর প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে সত্যিই বিরল। স্ত্রীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) তার ঐতিহাসিক বিদায় হজে¦র ভাষণে উল্লেখ করেন “নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, তাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ”।

তাছাড়া স্ত্রীকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আখ্যায়িত করে নবীজি (সা.) এরশাদ করেন “সমগ্র জগতই অস্থায়ী ভোগ্য সম্পদ, আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নেককার স্ত্রী”। তাছাড়া স্ত্রী’দের প্রশংসায় পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় আরো বলা হয়েছে “**স্ত্রীরা হল পুরুষদের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছ মেয়েদের পরিচ্ছদ**”। কেননা এ জগতে স্ত্রী’রা হল পুরুষদের জন্য শান্তি স্বরুপ। স্বামীদের জন্য প্রেম ভালবাসার পবিত্র এবং নিখুঁত আশ্রয়স্থল হল তার স্ত্রী। বিশে^র বহু সভ্যজাতি আজও আছে যারা স্ত্রী জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত তাদের মোহরানা প্রদান করে না এমনকি তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার জন্য নানাহ যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম স্ত্রী জাতির এ অধিকার সু প্রতিষ্ঠিত করে তাদের স্বাধীন মালিকানা স্বত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করে আর্থিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা আরো সুদৃঢ় করার শুভ প্রয়াসে স্বামীর উপর তার বিবাহিত স্ত্রীর মোহরানা প্রদান অত্যাবশ্যকীয় করে স্ত্রী জাতির আর্থিক অবস্থাকে আরও সমুন্নত করেছে।

কেননা স্বামীর উপর তার স্ত্রীর মোহরানা প্রদান আল্লাহপাক প্রদত্ত এক ঐশী নির্দেশ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে সূরা নিসায় উল্লেখ আছে “আর তোমরা তাদের (স্ত্রী)

মোহরানা সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান কর"। তাছাড়া ইসলাম মৃত ব্যক্তির সম্পতিতেও স্ত্রীর অর্থনেতিক অধিকার সুনিশ্চিত করছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে প্রথমেই তার স্ত্রীর বকেয়া মোহরানা আদায় কর হয়। যদি মোহরানা বকেয়া থাকে। আর বাকি সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাতেও স্ত্রীর একটা অংশ নির্ধারিত থাকে। কেননা মোহরানা প্রদান স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য করুনা ভিক্ষা বা ব্যক্তিগত বা সামাজিক আভিজাত্যের কোন ট্র্যাডিশন নয় বরং তা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার, তার পাওনা। এ নিয়ে গড়িমসি কিংবা অবহেলার কোন সুযোগ নেই। স্ত্রীর মোহরানা আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি সর্ম্পকে মুসনাদে আহমাদে নবীজি (সা.) এরশাদ করেন "যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে মোহরানা দেবার ওয়াদা দিয়ে বিয়ে করে কিন্তু মোহরানা আদায়ে ইচ্ছে নেই সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে একজন অপরাধী হিসেবে দাঁড়াবে"। একই প্রসঙ্গে হাদিসে আরও উল্লেখ আছে "পাঁচ ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ অবর্তিত হবে তাদের মধ্যে একজন হল যে, স্ত্রীকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে এবং তার উপর অত্যাচার করে"।

ইসলাম দাম্পত্য জীবনেও স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, নির্যাতন করে তাদের জীবন অতিষ্ট এবং দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় এরশাদ করেন "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাহভাবে কষ্টদান এবং উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না, যে লোক এরূপ করে সে নিজের উপরই জুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত কর না"। একই প্রসঙ্গে নবীজি (সা.) আবু দাউদ শরীফে এরশাদ করেন "আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারধোর করনা"।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্ত্রীদেরকে স্বামীর দাসী বলা হয় নাই বরং আল্লাহর দাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দাসী ভাবার কোন অবকাশ ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম স্ত্রীদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং তাদের প্রতি অশালীন আচরণ করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া

স্বামীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীদেরকে সর্বদা অকৃত্রিম ভালবাসা, আদর, সোহাগ এবং মায়ামমতার পরশে বেঁধে জীবন চলার পথে এগিয়ে যেতে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে,

'তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)।

স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক।' (মুসলিম শরিফ)।**

স্ত্রী হিসেবে শুধু ন্যায়সংগত অধিকারই নয়, সম্মানজনক আচরণ ও উত্তম ব্যবহারও নারীর প্রাপ্য।তিনি আরও বলেন,

'তোমাদের মধ্যে সে–ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (তিরমিজি)

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো।' (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)

ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বামীর অনুরূপ।কোরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, **'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮)।**

কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে। এমনকি যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অশেষ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যারা বিধবা নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী। (বুখারি ও মুসলিম)।

নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ

রাসুলের একটি হাদিসে এসেছে, **নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল—এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।**

কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারীগণ:

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বহু বিখ্যাত নারীর উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে সেরা ছিলেন। যেমন: জগন্মাতা মা হাওয়া (আ.), আদমকন্যা আকলিমা, ইব্রাহিম (আ.)-এর পত্নী সারা, ইসমাইল (আ.)-এর মাতা হাজেরা, মিসরপতির স্ত্রী জুলায়খা, সুলাইমানের পত্নী সাবার রানি বিলকিস, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া, আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহিমা, ইমরানের স্ত্রী হান্না, ঈসা (আ.)-এর মাতা বিবি মরিয়ম, নবী করিম হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতা আমেনা ও দুধমাতা হালিমা সাদিয়া; উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.), হাফসা (রা.), আয়িশা (রা.), মারিয়া (রা.)সহ নবী পত্নীগণ; নবীনন্দিনী রুকাইয়া, জয়নব, কুলসুম ও ফাতিমা (রা.); আবু বকরের কন্যা আসমা, শহিদা সুমাইয়া ও নবীজির দুধবোন সায়েমা।

অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামে পরিবার-পরিজন চালানোর জন্য, ভরণ-পোষণের জন্য নারীর অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নারীরা যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পদসহ অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কর্তৃত্ব শুধু তাদেরই থাকে।

তারা তাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে।

কোরআন শরিফে বলা হয়েছে,

'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩২)

কোরআন ও হাদিসে কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হয়নি। তবে শর্ত হলো, এ কাজ শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশে বলেছেন,

'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।' (বুখারি)

এ জন্য দেখা যায়, তৎকালে মুসলিম নারীরা অবস্থাভেদে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে। এ ব্যপারে কোরআন শরিফে একাধিক আয়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোরআন শরিফের সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা মায়েদায় বলা হয়েছে যে নারীরা স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। এ ছাড়া ইসলামে নারীদের বিয়েতে মোহরানার (দেনমোহর) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সম্পদ লাভ করে। এ সম্পদের ওপর একচ্ছত্রভাবে অধিকার শুধু নারীরই আছে।

ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার

পরকালীন কল্যাণেও পুরুষদের মতো নারীদের অধিকার আছে।

কোরআন শরিফে বলা হয়েছে,

‘আর যে সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ঈমানদার হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৪)

এ ব্যাপারে কোরআন শরিফের আরেকটি **সুরা নাহলে** বলা হয়েছে, ‘পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, যদি সে মুমিন হয় তাহলে তাকে আমি দুনিয়াতে পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং পরকালের জীবনেও এদের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দেব।’ (সুরা নাহল, আয়াত : ৯৭)

এ দুটি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, জান্নাত লাভের জন্য তথা পরকালের কল্যাণ লাভের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার।

নারীর পছন্দমতো বিয়ের অধিকার

ইসলাম নারীকে তার পছন্দমতো বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। (সাহাবি) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তার অনুমতি কিভাবে নেব? তখন তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর নীরব থাকাই তার অনুমতি।’ (বুখারি)

আর কুমারী নারীর বিয়ের ব্যাপারে আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, একটি কুমারী নারী তো লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারি)

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, একশ্রেণির পুরুষ হীনস্বার্থে ভদ্র পরিবারের নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করছে; সংশ্লিষ্ট নারীর ছবি অন্য খারাপ নারীর ছবির সঙ্গে সম্পাদন (Edit) করে অশ্লীল ছবিতে রূপান্তরিত করে জঘন্য কুৎসা রটনা করে প্রচারমাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুকে দিচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সতী-সাধ্বী নারী ও তার পরিবার-পরিজনকে অসহনীয় অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।

এ রকম অপবাদ থেকে নারীর সুরক্ষা পাওয়ার জন্য **কোরআন শরিফে** বলা হয়েছে,

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।' (সুরা নুর, আয়াত : ৪)

পরিশেষে মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামই **১৪০০** বছর আগে নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করেছে। এ জন্যই প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী **পিয়েরে ক্রাবাইট (Pierre Crabite)** ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা (আল্লাহ পাক থেকে প্রাপ্ত ইসলাম ধর্মের প্রচারক)

মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে 'Muhammad was the world greatest Champion of women's rights the world has ever seen.'

[মুহাম্মদ (সা.) হলেন নারী অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি]

নারী তাঁর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস।

নারীর মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى '

মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্ত্তসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' (নিসা ৩)।

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’।[৭]

মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ’ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।

মানবাধিকার রক্ষায় ইসলাম

ইসলামে মানবাধিকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়। মানবাধিকারের বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বত্র সমান। মানবজাতিকে ইসলাম গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মানুষকে সমান অধিকার, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইসলামে বংশ মর্যাদা, শ্রেণিবিভেদ, জাতিগত বিভেদ ও বর্ণবিভেদ হতে সতর্ক করেছে। দাস-দাসী ও অধীনস্তদের প্রতি সুন্দর ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষ হিসেবে সবাই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। মৌলিক অধিকার সবার সমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকারও সবার ক্ষেত্রে সমান। ব্যক্তি স্বাধীনতাও সবার ক্ষেত্রে সমান। মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামে ধনী-গরিব সবাই সমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও সবার ক্ষেত্রে এক। জানমালের নিরাপত্তার অধিকার একই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ বাকস্বাধীনতা সবার ক্ষেত্রে এক। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যুগে যুগে মানবতার মুক্তি ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার আশাবাদ শুনিয়েছেন বিভিন্ন মহামানব। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (সা.) সপ্তম শতকে হাজির হয়েছিলেন মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে নতুন ধারণা নিয়ে। তিনি প্রচার করেছেন মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সম্পত্তি বা অন্য কোনো মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। এটি একটি সমন্বিত ধারণা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামই প্রথম স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। মৌলিক অধিকারকেই মানবাধিকার বলে। ইসলামে মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝানো হয়, যেগুলো স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তার বান্দাকে প্রদান করেছেন। পৃথিবীর কেউ তা রহিত করার অধিকার রাখে না। এ অধিকার কখনো রহিত হওয়ার নয় ইসলামের প্রথম যুগে মদিনা ভিত্তিক সমাজে মুসলিম নাগরিকরা সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব অধিকার ভোগ করতেন। ইসলামে ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনের নিরাপত্তা, নারীর অধিকার, হত্যা না করা, গিবত না করা, ক্ষমা প্রদর্শন, সদাচরণ, রাজনৈতিক অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, ব্যক্তিগত অধিকারসহ অনেক কিছু। সামাজিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মালিকানার অধিকার, সাম্যের অধিকার, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার, লেখা, বলা ও প্রচার কার্যের অধিকার। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও চমৎকার অবয়বে সৃষ্টি করেছি' (সূরা আততিন : ০৩)। আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বাছাই করা হয়েছে, মানবের কল্যাণের জন্য'- (সূরা আল-ইমরান : ১১০)।

মানুষে মানুষে সাম্যের ধারণাটি পাওয়া যায় অন্য আয়াতে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও নারী হতে'- (সুরা হুজরাত : ১৩)। ইসলামের শান্তির বাণী শুধু নিজ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরমত ও পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সহানুভূতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যে গুরুত্ব দেন রাসুল (সা.)। উম্মার ধারণার মধ্যে অন্যান্য ধর্মের স্বাধীনতা ও অধিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাসুল (সা.)-এর সময়কালে করা চুক্তিগুলো দেখলে সেটি বুঝা যায়। **হিজরি ৬২৪ সালের 'মদিনা সনদ'** মানবাধিকারের স্বীকৃতির জন্য বিখ্যাত। **এই সনদে ৪৭টি ধারা ছিল**। ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা একটি জাতি গঠন করবে। ২. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ৩. রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হলো। ৪. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। ৪. ইহুদিদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। ৫. নবুয়াত প্রাপ্তির আগে হজরত আব্বাস (রা.)-সহ অন্যদের নিয়ে গঠিত হিলফুল ফুজুল ছিল বর্ণবাদে আক্রান্ত অন্ধকার আরবে মানুষের স্বাধীনতা ও বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি।

৬. রাসুল (সা.) তার বিদায় হজের ভাষণে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-দাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান। তিনি বলেন, কোনো আরবের ওপরে অনারবের প্রাধান্য নেই। প্রাধান্য নেই কোনো অনারবের আরবের ওপর। ৭. সাদা মানুষের প্রাধান্য নেই

কালো মানুষের ওপর। রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর এই ধারা অব্যাহত ছিল। ৮. যেমন হজরত আবু বকর (রা.) তার প্রথম ভাষণে বলেন, 'আমি সৎ পথে থাকলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং সমর্থন জোগাবেন, আর বিপথগামী হলে উপদেশ দিয়ে পথে আনবেন।' ৯. হজরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালেও প্রত্যেক নারী ও পুরুষ পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ছিল। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজস্ব অভিমত, অভিযোগ, বিকল্প প্রস্তাব ইত্যাদি পেশ করতে পারতেন। ১০. মানুষের সম্মান কোনো বর্ণ-গোত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে না। বরং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বা তাকওয়া নির্ধারণ করবে ব্যক্তির মর্যাদা। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে- 'আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো যারা তাকে ভয় করে' (সুরা আল হুজরাত)। ১১. সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস এবং জানমালের হেফাজতের হচ্ছে একজন মানুষের সামাজিক অধিকার। ইসলাম কাউকে কারো মর্যাদা হরণ ও অন্যায়ভাবে হত্যার অনুমোদন দেয় না। আল্লাহ বলেন, 'অন্যায়ভাবে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানষকে হত্যা করল।' হাদিসে বলা হয়েছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।' এমনকি যুদ্ধের সময় বিরোধী পক্ষের নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভালো আচরণের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজে যখন ইসলামের শান্তিপূর্ণ বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে পালিত হবে এবং সামগ্রিকভাবে তা বাস্তবায়িত হবে, তখন মানুষ আর অধিকার বঞ্চিত থাকবে না এবং সেটাই জগৎবাসীর প্রত্যাশা।

হিন্দু ধর্মে নারী

প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ ছিলো এক অন্যের বিরোধী।নারীদের বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন হয় নি।ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন যুগগুলোর বর্ণনা দেখলেই এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

বৈদিক যুগে নারী

'বৈদিক যুগ' বলতে যদি আমরা ঋগ্বেদ ও বেদাঙ্গসূত্র-এর মধ্যবর্তী সময়কাল বুঝি, এবং যথাযথ বৈদিক যুগের সময়সীমা যদি সেটাই হয় তাহলে তার ব্যাপ্তি সতেরো থেকে আঠারোটি শতক।এই সময় নারীদের সাথে আচরণ ছিলো:

(১) অবশ্যই এই সময়ে নারীর অবস্থান আগাগোড়া এক ছিল না। ঋগ্বেদ-এর প্রাচীন অংশে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করছে।

(২) নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঊষস অর্থাৎ ভোর এক রূপসী, সুসজ্জিত রমণী; তাকে সম্পূর্ণ বাধাহীন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'শুচি ও সুন্দর ঊষস, রক্তবস্ত্রে সজ্জিতা যেন সদ্যস্নাত, মায়ের হাতে স্নেহভরে প্রসাধিতা এক কন্যা।'

(৩) 'হাস্যমুখী বধু যেমন স্বামীর সামনে নিজের রূপ উন্মোচিত করে তেমনি ঊষা তার রূপ উন্মোচিত করেন।

(৪) এ ছাড়া তাকে নির্লজ্জাও বলা হয়েছে।

(৫)এর থেকেই নারীর স্বাধীন বিচরণ বিষয়ে সমাজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অংশটি ঋগ্বেদ রচনার অর্বাচীন সময়কার। 'অগ্নি মানুষের স্তুতি তেমন ভাবেই উপভোগ করেন, যেমন ভাবে প্রেমিক পতি স্ত্রীকে উপভোগ করেন।'

(৬) 'আমাদের স্তুতি তোমাকে তেমনি ভাবে স্পর্শ করুক, যেমন ভাবে স্বামীর স্পর্শে স্ত্রীর কামনা জেগে ওঠে।'

(৭) 'অগ্নি স্বামীর দ্বারা সম্মানিত স্ত্রীর মতোই পবিত্র।'

(৮) লক্ষ্য করা যেতে পারে, দেবতার পবিত্রতা মর্ত্য নারীর পবিত্রতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একের পর এক চিত্রকল্পে নারীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারী পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভক্তের ইষ্টদেবতার প্রতি আবেদনের।

(৯) সূর্য উষার পিছনে পিছনে যান, যেমন পুরুষ যায় নারীর পিছনে। এমনকী পুরুষের প্রতি নারীর কামনাকেও খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'

(১০) সূর্য উষার উপপতি; 'জারোন'–বারে বারে ব্যবহৃত এই অংশটির মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র বহুবার পাওয়া গেছে। পিতা ও কন্যার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের বিষয়।

(১১) ভাইবোনের মধ্যে এই সম্পর্ক বিখ্যাত যম-যমী সংবাদ সূক্তের বিষয়।

(১২) 'নদীগুলি বিশ্বামিত্রের দিকে যায়, যেমন নারী নত হয় চুম্বনোদ্যত পুরুষের দিকে।'

(১৩) 'যেমন প্রিয়া পত্নী প্রেমিক স্বামীর মধ্যে আনন্দ পায়, হে ভক্ত, তুমিও যেন আমার মধ্যে সেই আনন্দ পাও।'

(১৪) আবার ভক্ত ও ইষ্ট দেবতার তুলনা করা হচ্ছে মনুষ্যমিথুনের সঙ্গে। ঘৃতের ধারা সোমের দিকে যায়, যেমন সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী যায় স্বামীর কাছে।'

(১৫) অবিবাহিতা নারী তার স্বামী বেছে নিতে পারে না।

(১৬) গৃহে তার কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা নেই, শুধু বলা হয়েছে সে জল আনত এবং ক্ষেতের দেখাশোনা করত।

নারী ছিলো কেবল ভোগের জন্য ।নারীদের কে সম্পদ দিয়ে তুষ্ট করতে বলে নারীকে লোভী বলে মনে করত বৈদিকরা।

মনুসংহিতা- য় নারী

মনুসংহিতা হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ।মনুস্মৃতি মোট শ্লোক **২৬৮৫** টি অর্থাৎ বেশির ভাগ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। **ডক্টর সুরেন্দ্রকুমার** মনুস্মৃতি নিয়ে গবেষণা করার পর তিনি মনুস্মৃতি থেকে বেদানুকূল শ্লোক **১২১৪** টি পেয়েছে এবং বেদ বিরোধী প্রক্ষিপ্ত শ্লোক **১৪৭১** টি পেয়েছেন।

মনুস্মৃতিতে ১২১৪ শ্লোকের সাথে ১৪৭১ শ্লোক পুরোই স্ববিরোধী, এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনুস্মৃতির মধ্যে এই বেদ বিরোধী শ্লোক গুলো ঢুকানো হয়েছে আর এই শ্লোক গুলোতে আছে মাংস খাওয়া, পশুবলি, শুদ্রদের ঘৃণা করা, নারীদের ঘৃণা করা ইত্যাদি..মনুসংহিতা হলো বেদের ই সিদ্ধান্ত।

ধর্ম হয় শান্তির জন্য,সুরক্ষার জন্য।সেই ধর্মগ্রন্থে নারীদের কে কেমন মূল্যায়ন কি হয়েছে দেখলেই সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে

নীৎশে বলেছেন "I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of woman as in the Law book of Manu"

মনু তো এটাও বলেছেন, "যত্র নার্য্যন্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। অর্থাৎ, যে গৃহে নারীকে সম্মান দেয়া হয় বা পুজো করা হয় সে গৃহ তো দেবালয়। এ তো বেশ কথা, তাই তো হওয়া উচিৎ। কিন্তু আসল মনুস্মৃতিতে নারীর স্থান নিয়ে কি বলা আছে পড়লে বুঝা যাবে।পাশে অধ্যায় এবং শ্লোক নাম্বার বলা আছে।

গোড়ায় সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হচ্ছে স্রষ্টা নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ হলেন, বাকি অর্ধে নারী। তার থেকে বিরাট পুরুষ সৃষ্ট হল, যিনি মনুর স্রষ্টা। (১/৩২)

এ তো একেবারে কবি নজরুলের লাইনঃ "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর; অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"। (সাম্য)

তবে তো নারী পুরুষ সমান সমান, কোন পক্ষপাতের প্রশ্নই ওঠে না। তবে রামায়ণ ও মহাভারতে নিশ্চয়ই নারীদের বিশেষ সম্মান দেয়া হয়েছে। কারণ মহাপুরাণের চরিত্ররা, মায় বশিষ্ঠের মত কুলগুরুরা কথায় কথায় মনুস্মৃতির দোহাই দেন। তাহলে মায়ের মুখের কথায় দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভাগ হয়ে যান কী করে? তাঁর কী ইচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করা হয় না? এরপর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে জুয়োয় পণ রেখে হেরে যান কী করে? এবং সর্বসমক্ষে পত্নীকে বিবস্ত্রা করা হলে কোন ধর্মশাস্ত্রের নীতি মেনে মাথা নিচু করে গুডবয় হয়ে বসে থাকেন? নারী কি জমিজিরেত টাকাপয়সা গয়নার মত লুটের মাল? মনু কী বলেন?

- স্ত্রীলোক হল রথ, অশ্ব, ছত্র, ধন, ধান্য, পশু, জিনিসপত্র বা তামার মতোই লুটের মাল; যে জিতে নেবে তার। (৭/৯৬)

এই জন্যেই বোধহয় পঞ্জিকায় বিশেষ বিশেষ তিথিতে কোন কোন জিনিস সেদিন খাওয়া যাবেনা তার লিস্টিতে "স্ত্রীসম্ভোগ" জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, মৎস্য, মাংস, অলাবু ও বার্তাকু ভক্ষণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ।

মহাভারত হল, এবার রামায়ণের সাক্ষ্য দেখা যাক।

উত্তরভারতে এখন একজনই আরাধ্য— মর্য্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্র

কিন্তু আদর্শপুরুষ রামের পত্নীর প্রতি ব্যবহারও তো আদর্শ হওয়া উচিত। অথচ বাল্মীকি রামায়ণে দেখছি উনি **সীতাকে দু'দুবার সতীত্বের** অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন। আসন্ন প্রসবের সময় গুপ্তচরের চুকলি শুনে সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, লঙ্কা বিজয়ের পর পতির দেখা পেয়ে আনন্দিত সীতাকে কটুবাক্যে বললেন — 'সীতা, ভেব না আমি তোমার জন্যে এই যুদ্ধ করেছি। আমি রাবণকে পরাজিত করে লঙ্কা দখল

করেছি নিজের সম্মান ও হৃতগৌরব উদ্ধার করতে। আজ আমার পৌরুষ তৃপ্ত'। সীতা অবাক, সীতা কাঁদো কাঁদো।

রামের ক্রোধ বেড়ে গেল। চোখ পাকিয়ে সীতার দিকে তাকিয়ে উনি উপস্থিত সমস্ত রাক্ষস ও বানর সেনার সামনে সীতাকে বললেনঃ

"সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ, কিন্তু তুমি আমার চক্ষুশূল। কারণ তোমার চরিত্র নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কাজেই তোমাকে অনুমতি দিলাম – দশ দিকের যেকোন দিকে সোজা চলে যাও। দূর হয়ে যাও। পরগৃহে এতদিন ছিলে, কোন উচ্চবংশীয় পুরুষ এমন নারীকে ফিরিয়ে নেবে? তুমি রাবণের অঙ্কশায়িনী। আমি যা বলছি তা অনেক ভেবে বলছি। যদি মন চায় তো লক্ষ্মণ, ভরত, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বা রাক্ষস শ্রেষ্ঠ বিভীষণ — যার কাছে ইচ্ছে হয় চলে যাও। রাবণ তোমার অপরূপ স্বর্গীয় রূপ দেখেছিল। নিশ্চয়ই ওর গৃহে তোমাকে ছুঁয়েছে"।

সীতা কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারালেন। (**তথ্যসূত্র:**মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংস্কৃত থেকে নীতি আয়োগের প্রাক্তন সদস্য বিবেক দেবরায়ের করা ইংরেজি থেকে বাঙলা অনুবাদ; অবশ্য আমার কথায় বিশ্বাস নাহলে আগ্রহী পাঠক এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ ওঁর রচনাসংগ্রহে দেখে নিতে পারেন)। অবশ্য কৃত্তিবাসী বা তুলসীদাসী রামায়ণ ভক্তের দৃষ্টিতে রচিত, তাই সেখানে এ'রকম বেশ কিছু অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

যদিও বর্তমান সমাজের মূল্যবোধের মানদণ্ডে পত্নীর প্রতি রামের ব্যবহার ও কটুবচন শুধু অন্যায় নয়, অকল্পনীয়। কিন্ত সেই সময়ের মূল্যবোধে? তখন তো মনুস্মৃতিই পঞ্চম বেদের মর্য্যাদা পেয়েছিল।

বোঝাই যাচ্ছে, পুরুষ যখন সামাজিক প্রথা, আইনকানুন বানাতে শুরু করল, তখন নিজেদের দিকে টেনে খেলল। নারী আর সুখে দুঃখে সমান অংশীদার রইল না। 'ওরা' এবং 'আমরা'র খেলা শুরু হয়ে গেল। 'এ বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী, তুমি আছ, আমি আছি' শুধু কবির ইচ্ছেয় রয়ে গেল। মনুসংহিতায় এবার সেই খেলাটাই পর্বে পর্বে দেখব।

আসলে হাতির দেখানোর দাঁত আর চিবোনোর দাঁত আলাদা হয়। তেমনই মনুস্মৃতিতে মেয়েদের পুরুষের সমান বলে এবং দেবী বানিয়ে কুল্যে দুটো শ্লোক আছে। কিন্তু বাকি অধ্যায়গুলো জুড়ে মেয়েদের জন্যে বিধান দিয়ে যে প্রায় দুশো শ্লোক আছে? সেগুলো এবার একঝলক দেখা যাক।

সাধে কি "রামচরিতমানস" রচয়িতা ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেনঃ

"চোর ঢোর গাঁওয়ার শূদ্র অউ নারী,

ইয়ে সব হ্যায় তাড়ণ অধিকারী"

- স্ত্রী সন্তানের মা না হলেও পতির মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচর্য পালন করে স্বর্গে যাবেন। (৫/১৬০)।
- সন্তান লোভে যে নারী স্বামীকে এড়িয়ে ব্যভিচারিণী হন, তিনি ইহকালে নিন্দিত, এবং পরকালে পতিলোক থেকে পতিত হন। (৫/১৬১)
- স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দে হয়, সে পরের জন্মে শেয়াল হয়ে জন্মায় এবং যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি পাপরোগের শিকার হয়। (৫/১৬৪)
- স্ত্রী মারা গেলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বামী ওঁর চিতায় আগুন দিয়ে ফের বিয়ে করবেন। (৫/১৬৮)

- যে নারী পিতার ধনের গর্বে বা নিজ সৌন্দর্যের অহংকারে স্বামীকে ত্যাগ করে, তাকে রাজা সবার সামনে কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন। (৮/৩৭১)

স্বামী-স্ত্রীর পালনীয় ধর্মঃ

নবম অধ্যায়ে এব্যাপারে বিস্তৃত নির্দেশ দেয়া রয়েছে। এখানে স্থানাভাবে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

- পুরুষেরা স্ত্রীদের দিনরাত পরাধীন রাখবেন। (৯/২)
- স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়। (৯/৩)
- বিয়ের বয়েস হলে কন্যা সম্প্রদান না করলে পিতা, ঋতুকালে পত্নীগমন না করলে পতি, পিতা মৃত হলে মায়ের দেখাশুনো না করলে পুত্র নিন্দের পাত্র হয়। (৯/৪)
- অরক্ষিত স্ত্রীলোক পিতৃ, মাতৃ উভয়কুলের দুঃখের কারণ। (৯/৫)
- মদ্যপান, দুষ্টলোকের সংসর্গ, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ঘুরে বেড়ানো, অকাল নিদ্রা, পরগৃহে বাস — এই ছয়টি নারীর ব্যভিচারাদি দোষের কারণ। (৯/১৩)
- এরা রূপ দেখে না, বয়স দেখে না; পুরুষ রূপবান বা কুরূপ যাই হোক, পুরুষ দেখলেই সম্ভোগরত হয়। (৯/১৪-১৫)
- ব্রহ্মা এদের এমন স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই পুরুষ স্ত্রীলোকের রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ প্রযত্ন করবে। (৯/১৬)
- মনু স্ত্রীদের স্বভাবে দিয়েছেন – শয়ন, উপবেশন, অলংকার,কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, হিংসুটেপনা, মন্দ আচরণ। (৯/১৭)
- স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্তের শ্রুতি বা বৈদিক মন্ত্র হলঃ আমার মাতা যে অসতী হয়ে পরপুরুষ সম্ভোগ করতে চেয়েছেন, ওই ইচ্ছায় অপবিত্র হওয়া (মাতৃরজঃস্বরূপ) শুক্রকে আমার পিতা শুদ্ধ করুন (৯/২০)।

■ তবে নীচকুলে জাত স্ত্রী উচ্চকুলের পতির সঙ্গে মিলিত হলে পতির ভাল গুণ প্রাপ্ত হন। যেমন শূদ্রজাতীয় অক্ষমালা বশিষ্ঠের সঙ্গে এবং শারঙ্গী মন্দপালের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাননীয় হয়েছিলেন (৯/২৩)।

■ নারী হল খেত, পুরুষ হল বীজ। দুয়ের মিলনে সন্তান। কখনও খেত প্রধান, কখনও বীজ। উভয়েই সমান হলে সন্তান ভালো হয়ে জন্মাবে। (৯/৩৩,৩৪)

■ সন্তানের জন্ম দেয়া, তাদের বড় করা এবং প্রতিদিনের অতিথিসেবা আদি রীতিনীতির জন্যে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মী। (৯/২৬,২৭)

- যে মেয়ের ভাই নেই, পিতা কে জানা যাচ্ছে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে না কারণ কি জানি যদি ও তার কন্যাসমা হয়! (৩/১১)
- এক কন্যা বরকে দেখিয়ে অন্য কন্যা দান করলে এক শুল্ক দিয়েই পাত্র দুজনকেই বিয়ে করতে পারবে — এই হল মনুর বিধান। (৮/২০৪)

****** প্রথম স্ত্রী তো নিজেদের বর্ণের হতে হবে। (প্রথম বিয়ে তো বংশরক্ষার জন্যে; পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা) কিন্তু কামবশঃ ফের বিয়ে করতে চাইলে কন্যার যোগ্যতা নীচে দেওয়া হলঃ

১) ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণী ও তিন বর্ণের মেয়েকে।

২) ক্ষত্রিয়— ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্য ও শূদ্রের মেয়েকে।

৩) বৈশ্য— বৈশ্য ও শূদ্রের মেয়েকে।

৪) শূদ্র — শুধু শূদ্রের মেয়েকে। (৩/১২-১৩)

** কিন্তু ব্রাহ্মণের শূদ্র বৌ নিয়ে মনুমহারাজের বড্ড অস্বস্তি ছিল। গোটা পাঁচেক শ্লোকে অমন বিয়ে করলে ব্রাহ্মণের কী কী ঝামেলা হতে পারে তা' নিয়ে সতর্ক করেছেন। দুটো তুলে দিচ্ছিঃ

১) ব্রাহ্মণ শূদ্রাকে শয্যায় নিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।তাতে পুত্রোৎপাদন করলে ব্রাহ্মণত্বই চলে যায়। (৩/১৭)

২) যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করেন, তার শ্বাস নিজের শ্বাসে যুক্ত করেন এবং গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁর শুদ্ধি হয় না। (৩/১৯)

মেয়েও পছন্দ হল, এবার বিয়ে। কিন্তু বিবাহ যে আট রকম। কোনটা করব কীভাবে ঠিক হবে? ঠিক হবে বরের জাত দিয়ে।

যেমন ষষ্ঠ ও অষ্টম, ছেলে হয় এবং বেজোড় সংখ্যার রাতে, যেমন পঞ্চম বা সপ্তম, মেয়ে। তাই ছেলে চাইলে জোড় সংখ্যার রাত্রিতে দারগমন করিবেন (৩/৪৮)

- পুরুষের শুক্র বেশি হলে পুত্র, স্ত্রীর শুক্র বেশি হলে কন্যা জন্মায়। দু'জনেরই সমান সমান হলে জোড়া সন্তান বা হিজড়ে জন্মায়। কিন্তু দুজনের শুক্র খুব অল্প হলে গর্ভ হয় না। (৩/৪৯)

মাত্র ক'বছর আগে সল্ট লেকে এবং আরও দুয়েকটা জায়গায় হিন্দু বা বৈদিকশাস্ত্র মতে উত্তম মেধাবী সন্তান জন্মানোর গ্যারান্টি দিয়ে রীতিমত ওয়ার্কশপ খোলা হয়েছিল, অবশ্য ভাল ফী নিয়ে। বেশ কিছু দম্পতি নাম লিখিয়েছিলেন যেমন পুত্রসন্তানের গ্যারান্টি পেয়ে অনেকে হাতুড়ে ডাক্তারের নার্সিং হোমে নাম লেখান। অনেক বাপমা চাইবেন যে তাঁদের সন্তান বিদ্যাদিগগজ মহাধনুর্ধর হয়ে উঠুক। তো বিশ্বাসীরা নিজেরা যদি বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাতা ওল্টাতেন তো দেখতে পেতেন যে এর জন্যে নানান

ফর্মূলা তার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেয়া আছে। তার একটি হোল কালো বাছুর বা ষাঁড়ের মাংসের পলান্ন (বিরিয়ানি) রন্ধন করে স্বামীস্ত্রীর খেয়ে নেয়া।

এবার নারীরাই ভাবুন তাঁদের মর্যাদা কত উঁচুতে রেখেছে মনুর বিধান।

নিচে আরো কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

মূল্যবোধ আধুনিক কবির থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তা মনুর কিঞ্চিতও ছিল না।তাকেই কি করে সৃষ্টিকর্তা ভাবা যায়!! ছিলনা বলেই শূদ্রের পাশাপাশি, সকল বর্ণের নারীরই মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছিলেন মনু। নারীর যে কোনো উঁচুজাতেই সম্মানজনক স্থান নেই, তাই তিনি স্পষ্ট করেছেন। তার রচিত শাস্ত্রের নাম 'মানব শাস্ত্র' অথবা 'মনুসংহিতা' এবং তার ধর্মের নাম 'মানব ধর্ম'। বর্তমান মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীতে মনুর 'মানব ধর্ম' প্রকৃতপক্ষে ছিল 'দানব ধর্ম', শোষণ-বঞ্চনার এক মারণাস্ত্র। মনুকে হিন্দু সমাজের আইন-কানুনের মূল প্রবক্তা বলা যায়।

এই মনুসংহিতাতে নারীকে জঘন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন মনু, হরণ করেছেন তার সকল মৌলিক মানবিক অধিকার।

নারীদের সকল শিক্ষা,ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন মনু-

উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমেই বৈদিক সমাজে পুরুষেরা তাদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করতো কিন্তু মনু তার রচিত গ্রন্থে স্ত্রীদের উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ করেছেন এবং দেহশুদ্ধির জন্য তিন বর্ণের পুরুষদের যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত, স্ত্রীদের সে সকল মন্ত্র উচ্চারণে নিষেধ করেছেন। (২/৬৬) নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

নারীরা যে শিক্ষাহীন ছিল তা স্পষ্ট হয় মনুর নিচের উক্তিতে-

"যে ব্যক্তিকে অভিবাদন করা হবে সে ব্যক্তি যদি সংস্কৃত না জানেন তাহলে অভিবাদনের পর অভিবাদনীয় ব্যক্তিকে 'আমি অভিবাদন করছি'-এই কথা বলবেন। স্ত্রীলোকদেরকে এইভাবেই অভিবাদন করবেন।" ২/১২৩

নারীরা পুরুষদের ন্যায় সংস্কৃত জানেন না, তাই প্রকাশ পাচ্ছে এই শ্লোকে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও যে মহিলাদের ছিল না তা পরিষ্কার হয় মনুসংহিতার নিচের শ্লোক থেকে-

“যেহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই স্ত্রীজাতির জাতকর্ম সংস্কার পালিত হয় না তাই তাদের অন্তকরণ নির্মল হয় না। স্মৃতি শাস্ত্র ও বেদ প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রের ওপর স্ত্রীজাতির কোনো অধিকার নেই। তাই তারা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না।এমনকি কোনো মন্ত্রের ওপরেও স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তারা কোনো পাপ করলে মন্ত্রের সাহায্যে তা ক্ষালন করতে পারে না। তাই শাস্ত্রমতে স্ত্রিজাতি মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ।” ৯/১৮

আরো বলা হয়েছে,

“স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত এবং উপবাস নেই। কেবলমাত্র স্বামীর সেবা করেই স্ত্রীলোক স্বর্গে যেতে পারেন।” ৫/১৫৫

শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

“বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। সেখানে স্বামীর সেবাই হল গুরুকূলে বাস এবং স্বামীর গৃহ কর্মই হল প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন হোমরূপ অগ্নি পরিচর্যা।”২/৬৭

নারীদের সম্বন্ধে করা হয়েছে জঘন্য সব মন্তব্য-

“ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করা স্ত্রীলোকেদের স্বভাব। এই জন্য পন্ডিতেরা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অসাবধান হন না।”২/২১৩

“স্ত্রীগণ সৌন্দর্য বিচার করেন না। যুবা কী বৃদ্ধ সে ব্যাপারেও তাদের কোনো আপত্তি থাকে না। সুরূপই হোক বা কুরূপই হোক পুরুষ পেলেই তারা তার সঙ্গে সম্ভোগ করেন।” ৯/১৪

“পুরুষের দর্শন মাত্রেই স্ত্রীজাতির মনে তার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা জন্মায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চিত্তচাঞ্চল্য থাকে।” ৯/১৫

“শয়ন, আসন, ভূষণ,কাম, ক্রোধ,পুরহিংসা, কুটিলতা ও কুৎসিত ব্যবহার- এইসকল প্রবৃত্তি স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্টির সময় মনু কল্পনা করেছেন।অর্থাৎ ওইসকল প্রবৃত্তি নারীদের স্বভাবগত ব্যপার।” ৯/১৭

নারীর ‘অন্তকরণ নির্মল হয় না।’ ৯/১৮

শাস্ত্রমতে স্ত্রিজাতি মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ। ৯/১৮

” মূর্খই হোক আর বিদ্বানই হোক কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষদের অনায়াসেই বিপথে নিয়ে যেতে কামিনীরা সমর্থ হয়।” ২/২১৪

ঋতুমতী নারীকে অশুচি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অশুচিদের সাথে ঋতুমতী স্ত্রীও অশুচির পর্যায়ে পড়েছে-

“চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্মবধ করেছেন এমন পতিত ব্যক্তি, দশদিন পর্যন্ত নবপ্রসূতা সূতিকা,শব ও শবস্পর্শী- এদের স্পর্শ করলে স্নানের মাধ্যমেই শুদ্ধ হওয়া যায়।” ৫/৮৫

সুতরাং ভগবান মনুর কাছ থেকে কি শেখা গেলো? শেখা গেলো- চণ্ডাল, মরদেহ, খুনি, ঋতুমতী নারী, দশদিনের সন্তান প্রসবকারিনী সম অপবিত্রা।

ভ্রষ্ট পুরুষদের দোষ আড়াল করে মনু আউড়েছেন ভিন্ন বাণী, দোষ দিয়েছেন নারীর উপরেই-

“ইহ সংসারে দেহধর্মবশত সব মানুষই কাম ক্রোধের বশীভূত। তাই মূর্খই হোক আর বিদ্বানই হোক কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষদের অনায়াসেই বিপথে নিয়ে যেতে কামিনীরা সমর্থ হয়।” ২/২১৪

‘নারীদের এমন স্বভাবেই সৃজন করেছেন বিধাতা’ , তাই নারীদের সব সময় বশে রাখার (রক্ষার) ব্যাপারে পুরুষদের সচেষ্ট হতে বলেছেন মনু (৯/১৬)-

মনু বলেছেন,

“বাল্যকালে স্ত্রীলোক পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের বশে থাকবেন।পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ডের বশে থাকবেন। অর্থাৎ স্ত্রীলোক কখনোই স্বাধীনভাবে অবস্থান করবেন না।” ৫/১৪৮

“শাস্ত্রমতে বিবাহের পূর্বে স্ত্রী জাতিকে কন্যা অবস্থায় পিতা রক্ষা করবেন।যৌবন অবস্থায় বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করবেন। বৃদ্ধ কালে পুত্র রক্ষা করবেন। এমনকি পতিপুত্রহীন নারীকেও নিকটস্থ পিতৃ প্রভৃতিরা রক্ষা করবেন, কোনো অবস্থাতেই স্ত্রী জাতি স্বাধীন থাকবেন না।” ৯/৩

“স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনেরা দিনরাত্রির মধ্যে কখনোই স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে দেবেন না। বরং সর্বদাই নিষিদ্ধ রূপ ও রসের ব্যাপারে তাদের অনাসক্ত করে তাদেরকে নিজের বশে রাখবেন।”৯/২

“কী বালিকা, কী যুবতী, কী বৃদ্ধা গৃহে থাকাকালীন কোনো কাজই স্বতন্ত্রভাবে করতে পারবেন না।” ৫/১৪৭

“স্ত্রীলোক কখনোই পিতা,স্বামী বা পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করবেন না। কারণ এদের থেকে পৃথক হলে পিতৃকূল ও পতিকূল- উভয় কূলকেই তিনি কলঙ্কিত করবেন।” ৫/১৪৯

নারীদের বশে রাখার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন মনু-

“কোনো পুরুষই বল প্রয়োগ করে কোনো স্ত্রীকে সৎ পথে রক্ষা করতে পারে না। তবে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করলে স্ত্রীদের সহজেই রক্ষা করা যায়।” ৯/১০

উপায়গুলো হল-

“অর্থের সংগ্রহ ব্যয় সাধনে, নিজের শরীর ও গৃহ দ্রব্যের শুদ্ধিবিধানে , স্বামীর স্থাপিত অগ্নির শুশ্রুসায়, পাককার্যে এবং বিভিন্ন গৃহ দ্রব্যের পর্যবেক্ষণে স্ত্রী জাতিকে সর্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। এই সকল বিষয়ের কার্যভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করলে সর্বদাই সৎ কর্মে ব্যস্ততায় মগ্ন থাকায় কুকর্ম ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে না।” ৯/১১

নারীদের বশে রেখে শাসন করার জন্য ভগবান মনু বানিয়েছেন সকল বৈষম্যমূলক আইন; এমনকি নারীদের প্রহার করতেও বলা হয়েছে তার রচিত মানবশাস্ত্রে-

“পত্নীর সঙ্গে কখনোই তিনি (স্নাতক ব্রাহ্মণ) একপাত্রে ভোজন করবেন না ।” ৪/৪৩

“স্ত্রী,পুত্র,দাস,শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভাই অপরাধ করলে সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়ে অথবা বেণুদল বা বাঁশের বাখারি দিয়ে শাসনের জন্য তাদের আঘাত করবে। কিন্তু মনে রাখতে

হবে রজ্জু বা বাখারি দিয়ে শরীরের পৃষ্ঠ দেশেই একমাত্র আঘাত করতে হবে কখনোই উত্তমাঙ্গে বা মস্তকে আঘাত করা যাবে না।" ৮/২৯৮-৩০০

স্বামী অপরাধ করলে স্ত্রী কি করবে, এ বিষয়ে যে কিছু বলা নেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হিন্দু ধর্মে বিবাহ

হিন্দু ধর্মে **১ থেকে ১৬ বছর** বয়সের অজাতপুষ্পবালাকে 'কুমারী'নামে অভিহিত করা হয়েছে। বয়স অনুযায়ি কুমারীদেরকে ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হয়েছে।

যেমন: ১ বছর বয়সী কন্যাকে সন্ধা, ২ বছর বয়সী কন্যাকে স্বরসতী, ৩ বছর বয়সী কন্যাকে কালিকা, ৫ বছর বয়সী কন্যাকে সুভগা, ৬ বছর বয়সী কন্যাকে উমা, ৭ বছর বয়সী কন্যাকে মালিনী, ৮ বছর বয়সী কন্যাকে কুব্জিকা, ৯ বছর বয়সী কন্যাকে অপরাজিতা, ১০ বছর বয়সী কন্যাকে কালসন্ধর্ভা, ১১ বছর বয়সী কন্যাকে রুদ্রাণী, ১২ বছর বয়সী কন্যাকে ভৈরবী, ১৩ বছর বয়সী কন্যাকে মহালক্ষ্মী, ১৪ বছর বয়সী কন্যাকে পীঠনায়িকা, ১৫ বছর বয়সী কন্যাকে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ১৬ বছর বয়সী কন্যাকে অম্বিকা বলা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে যে, এসব নাম জগম্মাতার স্বরূপের এক একটি গুণ প্রকাশ করে।

হিন্দুশাস্ত্র বাৎস্যায়ন অনুসারে বিয়েকে ৮ প্রকারে ভাগ করা হয়। এগুলো হল ১. ব্রাহ্ম, ২. প্রজাপত্য, ৩. আর্য্য, ৪. দৈব, ৫. অসুর বা আসুরিক, ৬. গন্ধর্ব, ৭. পিশাচ বা পৈশাচিক এবং ৮. রাক্ষস বিয়ে। কারো কারো মতে বিয়ের এ ভাগগুলির পিছনে একইসাথে শাস্ত্র ও লোকাচার এ দুটোই ভূমিকা রেখেছে। কয়েকটি বিয়ে আছে যা সম্পুর্ণ লোকাচার ভিত্তিক। লোকাচার ভিত্তিক এ বিয়েগুলিতে কোন প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ

বা যাগযজ্ঞের প্রয়োজন হতো না। শাস্ত্র অনুমোদিত বিয়ের মূল অনুষ্ঠানগুলিতে মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ এবং বিধি অনুযায়ি কন্যা সম্প্রদান করা হতো।

৮ প্রকার বিয়ের মধ্যে প্রথম চার প্রকারের বিয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, আর্য্য ও দৈব বিয়েগুলি মূলত একই রকম, শুধুমাত্র পদ্ধতি এবং মন্ত্রের বিভিন্নতার জন্য নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন। এ বিয়েগুলিতে পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা কম, পিতা-মাতা বা গার্জিয়ানরাই এ বিয়ের আয়োজন করে থাকেন। শেষোক্ত চার প্রকার বিয়ে অর্থাৎ অসুর বা আসুরিক বিয়ে, গন্ধর্ব বিয়ে, পিশাচ বা পৈশাচিক বিয়ে এবং রক্ষস বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর ভূমিকাই মূখ্য।

গান্ধর্ব বিয়েতে অন্য নারীকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত নারীকে আকর্ষণ করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে নারীকে কাজে লাগানো হয়, তাকে বলা হয় **'ঘটকী'**। শব্দটি ঘটকের স্ত্রী লিঙ্গ। যেখানে পাত্রী কোন কারণে পাত্রকে পছন্দ করে না সেক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। ঘটকীর প্রধান কাজ হয় পাত্রের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে পাত্রীকে নানানভাবে প্রলুব্ধ করে তার মন পাত্রের অনুকুলে নিয়ে আসা। পাত্রীর পিতা-মাতা বা গার্জিয়ান যদি অন্য কোন পাত্রকে পছন্দ করে তবে সেই পাত্র সম্পর্কে নানারকম কুৎসা রটিয়ে পাত্রীর মনকে বিষিয়ে তুলে পাত্রের দিকে নিয়ে আসা। পাত্রীকে কনভিন্স করে পুরোপুরি পাত্রের দিকে অনার পরে তাদের দু'জনের অভিসারের ব্যবস্থা করা এবং প্রণয় ঘনিষ্ঠকরণের মাধ্যমে বিবাহ করানো। একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে অগ্নিস্বাড়্গী রেখে হোম করে গোপনে বিয়ে করিয়ে মিলন ঘটানো এবং পরবর্তীতে তা সমাজে প্রকাশ করাই এ বিয়ের বৈশিষ্ট। কাজটিকে সহজতর করার জন্য ঘটকীর বয়স এবং পাত্রীর বয়স কাছাকাছি রাখার কথা বলা হয়েছে। ঘটকী যদি পাত্রীর কাছাকাছি কেউ হয় তাহলে তাকেই এ দায়িত্ব দেওয়া উত্তম।

পৈশাচিক বিয়ে বাৎস্যায়নের যুগে প্রচলিত ছিল, এখন নেই। তরুণী যেখানে পাত্রকে পছন্দ করেনা এবং তাকে রাজি করানোর জন্য ঘটকী নিয়োগ করে গন্ধর্ব বিয়েও সম্ভব নয় সেখানে পৈশাচিক বিয়ে করা হতো। পাত্র, পাত্রীকে ফুসলিয়ে যুতসই কোন স্থানে নিয়ে তাকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে অধজ্ঞানহীন ও উত্তেজিত করে তার সাথে যৌনমিলন করে, পরবর্তীতে পুরোহিত ডেকে সেই নারীকে বিয়ে করা। এটা হলো নারীর সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে অনন্যপায় করে বিয়ে করতে বাধ্য করা। এজন্যই এটাকে বলা হয় পৈশাচিক বিয়ে। ধর্ষণকে সঙ্গায়িত করার পরে রাষ্ট্রীয় আইন ধর্ষিতার স্বার্থ সংরক্ষণ করায় এটি বন্ধ হয়ে গেছে।

রাক্ষস বিয়ে হলো জোর করে বিয়ে। কোন সুন্দরী বিয়েতে রাজি না হলে লোকজন নিয়ে জোর করে তাকে তুলে এনে পুরোহিত ডেকে হোম করে বিয়ে করা। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজারা এভাবে জোর করে পাত্রী ধরে এনে বিয়ে করতেন। এখন আর এ বিয়ের প্রচলন নেই। রাষ্ট্রীয় আইন জোর করে তুলে আনাকে স্বীকৃতি না দেয়ায় এটি বন্ধ হয়ে গেছে।

আসুরিক বিয়েতে পাত্রীর কোন আত্মীয়কে অর্থকড়ির বিনিময়ে হাত করে তার সাহায্যে পাত্রীকে ভুলিয়ে বিয়ে করা। বর্তমান সমাজেও এ ধরণের বিয়ে প্রচলিত আছে। তবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা প্রথম চার প্রকার বিয়ের মতো হয় বলে এটিকে আর আলাদাভাবে চোখে পড়ে না।

হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের বিয়েতে প্রধানত দু'টি আচারগত বিষয় পরিলক্ষিত হয় যথা, বৈদিক ও লৌকিক। লৌকিক প্রথাগুলি লোকাচার সম্পর্কীয় এবং অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বৈদিক প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা এবং বিয়ের মূল অঙ্গ। তবে এই রীতিগুলিও অঞ্চল, বর্ণ বা উপবর্ণভেদে ভিন্ন হতে পারে।

হিন্দু বিয়ে বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

প্রথম ধাপের নাম 'পটিপত্র'। এটি **'লগ্নপত্র'** বা **'মঙ্গলাচরণ'** নামেও পরিচিত। বিয়ের দিন-তারিখ, দেনা-পাওনার হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাকেই বলে পটিপত্র।

দ্বিতীয় ধাপের নাম 'পানখিল'। এটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়, একটি বরের বাড়িতে অন্যটি কনের বাড়িতে। মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠানে বাড়ির মেয়েরা ও প্রতিবেশীরা মিলে বিয়ের গান গাওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপের নাম 'দধিমঙ্গল'। এদিন বর ও কনে উপবাস থাকে। সম্পুর্ণ উপবাস নয়, এ সময়ে পানি ও মিষ্টি খাবার বিধান আছে।

চতুর্থ ধাপের নাম 'গায়ে হলুদ'। এটি সাধারণত বিয়ের দিনই সম্পন্ন হয়। প্রথমে বরের গায়ে হলুদ মাখানো হয়, পরে সেই হলুদ কনের গায়ে দেবার জন্য কনের বাড়িতে পাঠানো হয়।

পঞ্চম ধাপের নাম 'শঙ্খ কঙ্কণ'। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কনেকে শাঁখা পরানো হয়। এই পাঁচটি ধাপ আচার সম্পর্কীত, বিয়ের মূল অনুষ্ঠান নয়। বিকেলের দিকে ষষ্ঠ ধাপ থেকে শুরন্ন হয় মূল অনুষ্ঠান।

ষষ্ঠ ধাপের নাম 'বর বরণ'। কনের মা বা নিকট আত্মীয়া একটি থালায় প্রদীপ, ধান, দূর্বা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বরকে বরণ করেন।

সপ্তম ধাপের নাম 'সাতপাক'। বিয়ের মন্ডপে প্রথমে বরকে আনা হয় এবং পরে পিড়িতে বসিয়ে কনেকে এনে তাঁকে বরের চারপাশে সাতপাক ঘোরানো হয়। এ সময়ে কনে পানপাতা দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রাখে।

অষ্টম ধাপের নাম 'শুভ দৃষ্টি'। বিয়ের মন্ডপে বর ও কনে একে অপরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে।

নবম ধাপের নাম 'মালা বদল'। এ সময়ে বর ও কনে মালা বদল করে।

দশম ধাপের নাম 'সম্প্রদান'। কনের বাবা বা গার্জিয়ান, বরের কাছে বেদমন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন।

একাদশতম ধাপের নাম 'অঞ্জলী'। কনে ও বর একসঙ্গে আগুনে খই ছুড়ে দেয়। প্রচলিত বাংলায় একে বলে 'খই পোড়া'।

দ্বাদশ ধাপের নাম 'সিঁদুর দান'। এখানে বর বধুর মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেয়।

ত্রয়োদশ ধাপের নাম 'অগ্নিস্বাক্ষী। এসময়ে বরের ধুতির পিছনে বধুর শাড়ির আচল বেঁধে দেওয়া হয় এবং বরের পিছনে পিছনে বধু অগ্নিকে কেন্দ্র করে সাতবার ঘোরে। এটি হিন্দু বিয়ের শেষ রীতি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে পারিবারিক নিয়মে হয়, কোন রেজিষ্ট্রেশন হয়না। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে কোন চুক্তি বিশেষ নয়, এটি একটি পবিত্র বন্ধন ও ধর্মীয় নির্দেশ। দশটি অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে বিয়ে একটি। এখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ স্বীকৃত নয়। ভারতে **১৯৫৫** সালে হিন্দু বিয়ে রেজিষ্ট্রেশন আইন চালু হয়েছে এবং বিয়ে রেজিষ্ট্রেশনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখনও এমন কোন নিয়ম চালু হয়নি। ফলে এ দেশে হিন্দু মেয়েদের বৈবাহিক অধিকার এখনও আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়।

বিয়ে রেজিষ্ট্রেশান করে নারীর অধীকার রক্ষা করা উচিৎ, কারন নারী যেমন খারাপ চরিত্রের হতে পারে তেমনি পুরুষও হতে পারে। তাই বিয়ে রেজিষ্ট্রেশান করাই উচিৎ।কিন্তু এই অধিকার হিন্দু ধর্ম দেয় নি।নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে।

পূরাকাল থেকে শুরু করে বিয়ের নামে যেভাবে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে সেভাবে ধর্মের নামে নারীকে বলি দেওয়া হয়েছে।

নারীর বাল্যবিবাহ ও বিবাহে বয়সবৈষম্য:

"তিরিশ বছরের যুবক মনোমতো বারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। চব্বিশ বছরের যুবক মনোমতো আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। কিন্তু যদি ধর্মহানির আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর বেদ গ্রহণ যদি তিরিশ বা চব্বিশ বছরের আগেই শেষ হয় তাহলে আগেই বিবাহ করা যেতে পারে। টীকাকার কুল্লুকের মতে, কন্যার বয়স অপেক্ষা বরের বয়স প্রায় তিন গুণ বেশি হবে- এই মাত্রা জ্ঞাপন করাই এই বচনের তাৎপর্য। কন্যার বয়ঃক্রম নির্ধারণ করা এই বচনের তাৎপর্য নয়।" (৯/৯৪)

এইভাবে একদিকে নারীদের বাল্যবিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে শিশু কন্যার সাথে তার তিনগুণ বয়সের পুরুষের বিবাহের নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।

নিচুজাতির কন্যাকে ভোগ করার প্রবৃত্তি এবং উচ্চবর্ণের কন্যার সাথে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের অস্বীকৃতি

আর্যদের বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আপনারা সকলেই হয়তো কমবেশি জানেন। এই প্রথায় ব্রাহ্মণ সবচেয়ে সুবিধাভোগী ,শূদ্র সবচেয়ে নির্যাতিত আর অস্পৃশ্যদের তো মানুষ হিসাবে স্বীকৃতিই নেই। এই বর্ণপ্রথায় নারীভোগের এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল সুচতুর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ এর ঘাড়ে দোষ চাপানোর কারণ হল, এইসব রীতি নীতির তারাই প্রবক্তা এবং তারাই এর সবচেয়ে নির্লজ্জ সুবিধাভোগী। বর্ণপ্রথাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবার মধ্যে শিক্ষা, জীবিকা, ধর্মাচার সকল বিষয়ে অসাম্য ও বৈষম্য কাজ করতো এবং সেই বৈষম্যের কুৎসিত প্রকাশ পায় নারী বিবাহ/ ভোগ বিষয়ে।

বিবাহের ক্ষেত্রে বর ও কনের বর্ণ বিবেচনা করে বিবাহকে **দুই ভাগে** ভাগ করা হয়েছিল।

১/ অনুলোম বিবাহঃ উচ্চ বর্ণের পুরুষের সাথে নিম্নবর্ণের স্ত্রীর বিবাহ।

২/ প্রতিলোম বিবাহঃ এক্ষেত্রে কন্যা উচ্চবর্ণের ও বর নিম্নবর্ণের হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ মনু তার শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের অনুমোদন দেন এবং প্রতিলোম বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

এই অনুলোম-প্রতিলোম নিয়মের ফলে ব্রাহ্মণ চাইলে ব্রাহ্মণী,ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা যেকোনো বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারতো।

ক্ষত্রিয় পারতো ক্ষত্রিয়া,বৈশ্যা,শূদ্রা রমণীকে বিবাহ করতে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করা নিন্দনীয় ছিল।

বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রা নারীকে বিবাহ করতে পারতো কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করতে পারতো না।

কিন্তু শূদ্র বেচারা সবার নিচে অবস্থান করায় সে কেবল শূদ্রাকেই বিয়ে করতে পারতো তার অন্য বর্ণে বিবাহের কোনো অধিকার ছিল না।

এই পদ্ধতির বিশ্লেষণে দেখা যায় কূট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের নারীর উপর তার হস্ত চালনা করেছে।বাকি বর্ণ গুলোও পারছে অন্যান্যা বর্ণের নারীকে বিবাহ করতে কিন্তু শূদ্র জাতি (বিশেষত শূদ্র পুরুষ) বঞ্চিত হচ্ছে অন্য বর্ণে বিবাহে এবং শূদ্রা পরিণত হয়েছে সকল উচ্চবর্ণের সাধারণ ভোগ্যপণ্যে।

অপরদিকে, আর্যরা তাদের নারীদের ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। যখন উচ্চবর্ণের কোনো নারী নিম্নবর্ণের কোনো পুরুষকে বিবাহ করতে গিয়েছে তখনই উৎপন্ন সন্তানকে নিন্দনীয় বর্ণসংকর ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

মনু বলেন,

"নিকৃষ্ট জাতির কন্যা যদি সম্ভোগের জন্য নিজের থেকে উৎকৃষ্ট জাতির পুরুষকে ভজনা করে তাহলে ঐ কন্যার কিছুই দণ্ড হবে না।কিন্তু সে যদি অপকৃষ্ট জাতির পুরুষকে

ভজনা করে তাহলে যে পর্যন্ত তার কাম নিবৃত্তি না হয় সে পর্যন্ত তাকে গৃহে আটকে রাখতে হবে।”৮/৩৬৫

“উত্তম জাতির সকামা কন্যাকে অধম জাতির পুরুষ যদি ভজনা করে তাহলে ঐ পুরুষের শারীরিক বধ দণ্ড হবে। ...” ৮/৩৬৬

মহর্ষি মনু ‘কোনো অভিযোগ না করে উচ্চ তিন বর্ণের দাসত্ব (সেবা) করে যাওয়াকে’ – শূদ্রের কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু তার সমাজে নারী যেন অলিখিত শূদ্র। কোনো বর্ণেই তার যেন মর্যাদা নেই, স্বাধীনতা নেই। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীকে পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-রাজার দাস করে রেখেছিলেন মনু ও তার সমাজ। তাই তো দাসরূপ নারীকে বলা হয়েছে,

পতিসেবাই তার একমাত্র ধর্ম-

“পিতা স্বয়ং যে ব্যক্তির কাছে কন্যা দান করেছেন কিংবা পিতার অনুমতিক্রমে ভাই যে ব্যক্তির কাছে বোনকে দান করেছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্যন্ত তার সেবা করা এবং স্বামীর মৃত্যুর পরও ব্যভিচার না করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য।” ৫/১৫১

স্ত্রীলোককে গৃহ কর্মে দক্ষ হতে বলা হয়েছে। (৫/১৫০)

কায়মনোবাক্যে পতিসেবা পরায়ণতাই স্ত্রীজাতির ধর্ম। পতিসেবাপরায়ণ ভক্তিমতী স্ত্রীদের পুরষ্কার স্বরূপ স্বামী-পিতামহের পিণ্ডের উচ্ছিষ্ট দান করার কথা বলা হয়েছে। (৩/২৬২) কায়মনোবাক্যে পতিসেবাপরায়ণ নারীধর্ম পালনকারী নারী ইহলোকে অত্যন্ত সুখ্যাতি পান এবং মৃত্যুর পরে পতিলোকে গমন করেন। (৫/১৬৬-১৬৭) তাই স্বামীর জীবনকালে, এমনকি মৃত্যুর পরেও স্ত্রীদের অনিষ্টাচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পরেও কখনোই তার মৃত স্বামীর অপ্রিয় আচরণ না করতে বলা হয়েছে। এর ফলেই নাকি স্ত্রী তার উপার্জিত পূণ্যে স্বামীর কাছে স্বর্গে গমন করবেন (৫/১৫৬) এবং ইহলোকে সাধ্বী স্ত্রীর খেতাব প্রাপ্ত হবেন! (৯/২৯)

স্বামী ধন,মান,কূল,শীলে অপকৃষ্ট হলে স্ত্রীলোকের অন্যকোনো পুরুষকে গ্রহণ করাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে। (৫/১৬৩)

‘আমি ধনীর কন্যা’- এরূপ দম্ভরূপে অথবা নিজের সৌন্দর্যের অহংকারে কোনো নারী স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে গ্রহণ করলে তাকে লোকজনের সামনে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর সেই নারী যে পুরুষের সঙ্গ লাভ করেছিল তাকে গরম লৌহ শয্যায় শুইয়ে রেখে পুড়িয়ে মেরে ফেলার কথা বলা হয়েছে এবং যতক্ষণ না সেই পুরুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ততক্ষণ আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। (৮/৩৭১-৩৭২)

স্ত্রীর দাসত্ব স্বামীর মরণেও শেষ হয় না, তাকে মৃত স্বামীরও দাসত্ব করতে হয়।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীজাতির কর্তব্য-

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে- "...বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন কোনো বিধি লিখিত নাই যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হতে পারে।" ৯/৬৫

বিধবার জীবন ছিল মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর, বিধবার যাতে আর দৈহিক সৌন্দর্য না থাকে, সে যাতে আর অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করতে না পারে তাই কঠোর ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়ার জন্য বলা হয়-

"স্বামী মারা গেলে স্ত্রী পবিত্র ফলমূল আহার করে জীবন যাপন করবেন। কিন্তু কখনোই ব্যভিচারের ইচ্ছায় পরপুরুষের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না।" ৫/১৫৭

"যতদিন না নিজের মৃত্যু হয় ততদিন পর্যন্ত পতিপরায়ণা স্ত্রী ক্লেশ সহিষ্ণু ও নিয়মচারিণী হয়ে মধু মাংস ও মৈথুন বর্জন করে ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। অর্থাৎ সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের যা অন্যতম পরম ধর্ম সেই ধর্ম পালনেই তিনি একাগ্র হবেন।" ৫/১৫৮

" সদাচারশালী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করবেন। কিন্তু কখনোই পরপুরুষের সংযোগে পুত্র উৎপাদন করবেন না। কারণ অপুত্রা হলেও উক্ত ব্রহ্মচারীদের (বালখিল্য ঋষি) মতোই তিনিও স্বর্গে গমন করতে পারবেন।"৫/১৬০

স্ত্রী যাতে পরপুরুষের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক না করতে পারে সেদিকে আর্যরা বেশ সচেষ্ট ছিল। (৯/৮-৯)বিধবা রমণীকে ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে, "স্ত্রীলোক যদি পরপুরুষের উপভুক্ত হন তাহলে ব্যভিচার দোষে সংসারে নিন্দনীয় হন। এইরূপ স্ত্রীলোক পরকালে শেয়াল হয়ে জন্মান এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন পাপরোগে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত পীড়া ভোগ করেন।" (৫/১৬৪ ; ৯/৩০)

সুতরাং **স্ত্রীজাতির দায়িত্ব আমরণ তার স্বামীর সেবা করা এবং স্বামীর মারা গেলেও তার অপ্রিয় আচরণ অর্থাৎ অন্য পুরুষের সংসর্গ না করা এবং পুনরায় বিবাহ থেকে বিরত থাকা এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করা।**

নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবার কোনো অধিকার হিন্দু ধর্ম নারীদের দেয় নি।

এবার তাদের স্ত্রীদের আজীবন কষ্টের কি প্রতিদান দিয়েছেন আর্যপুরুষেরা দেখা যাক-

নারীদের সাথে প্রতারণার ভালোই পথ তারা বেছে নিয়েছিল আর্য পুরুষেরা। মনু তাদের সেইরকমই শিক্ষা দিয়ে বলেন,

"'তুমি আমার পরম প্রেয়সী,অন্যকে আমি প্রার্থনা করিনি'- এইভাবে সঙ্গ লাভের জন্য কামিনী (নারী) বিষয়ে মিথ্যা শপথ করলে পাপ হয় না। 'আমি অন্য বিবাহ করবো না', এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ বিষয়ে এবং গোরুর ভক্ষ্য বিষয় সম্বন্ধে ,হোমের জন্য কাষ্ঠ আহরণ বিষয়ে এবং ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য মিথ্যা শপথে কোনো পাপ হয় না।" ৮/১১২

বিবাহিতা নারীর প্রতি শক্ত হয়েছে আর্যসমাজ, নারীর ত্রুটি পেলেই তাকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। মনুর শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

মদ্যপানে আসক্ত, দুশ্চরিত্র, পতিবিদ্বেষিণী, কঠিন রোগগ্রস্থ, অপকার সাধনে সক্ষম, ধনক্ষয়কারী স্ত্রীকে ত্যাগ করে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। (৯/৭৯-৮০)

"...স্ত্রী যদি অপ্রিয়ভাষিণী হন তাহলে কালক্ষয় না করে তৎক্ষণাৎ স্বামী বিবাহ করবে।" ৯/৮১

"স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হন তাহলে স্বামী স্ত্রীর জন্য এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করবে। তার মধ্যে স্ত্রীর দ্বেষভাব গত না হলে স্বামী তাকে অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তার সহবাস ত্যাগ করবে।" ৯/৭৭

ঘরে স্ত্রী থাকার পরেও স্বামী যদি পুনরায় বিবাহ করেন, আর তাতে স্ত্রী যদি নারাজ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হন তাহলে সেই স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে মনুস্মৃতিতে অথবা সেই স্ত্রীকে আত্মীয় স্বজনের সামনে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। (৯/৮৩)

এবং সর্বোপরি সতী সাধ্বী স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে বলা হয়েছে-

"সতী সাধ্বী স্ত্রী আগে মারা গেলে তার দাহকার্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করার পর পুরুষ পুনরায় বিবাহ করবেন এবং পুনরায় অগ্ন্যাধান কর্ম সম্পন্ন করবেন। এইভাবে পূর্বোক্ত বিধান অনুযায়ী নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করবেন এবং পুনরায় দার পরিগ্রহ করে পরমায়ুর দ্বিতীয় ভাগে গৃহস্থাশ্রমেই বাস করবেন। "৫/১৬৮-১৬৯

পুত্রপ্রাপ্তিতে মরিয়া মনুর সমাজ-

পুত্রের জন্য মানুষ স্বর্গ লাভ করে। পৌত্রের জন্য মানুষ ঐ স্বর্গ লোকে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে এবং প্রপৌত্রের জন্য মানুষ সূর্যলোক লাভ করে। মনুসংহিতা ৯/১৩৭

পুত্র শুধু স্বর্গে পৌঁছাতে সাহায্য করে না, স্বর্গের সাথে সাথে পুত্র নরক থেকেও তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে ও রক্ষা করে-

"পুত্র যেহেতু পিতাকে পুৎ নামক নরক থেকে ত্রাণ করে তাই ব্রহ্মা স্বয়ং 'পুত্র' এই নাম রেখেছেন। পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য শাস্ত্রে বলা হয়নি। কারণ দৌহিত্র পরলোকে পৌত্রের মতোই মাতামহকে পরিত্রাণ করে।..." ৯/১৩৮-১৩৯

সনাতন নারী শস্যক্ষেত্র, পুরুষ সেই ক্ষেত্রের মালিক-

পুত্র যেহেতু স্বর্গের দ্বার ও নরক হতে উত্তরণের পথ তাই আর্যরা পুত্রলাভের জন্য অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কখনো কখনো দেখা গেল, কোনো কোনো আর্যপুরুষ ললাটদোষে উর্বরতাহীনতার কারণে পুত্র উৎপাদনে অক্ষম। কেউ কেউ অপুত্রক অবস্থায় ভুত-প্রেতে পরিণত হল। এমন জটিল পরিস্থিতিতে ভগবান মনুই তাদের পথ দেখালেন, বাতলে দিলেন পুত্রপ্রাপ্তির পথ । যেহেতু বেদে বলা আছে বিধাতা নারীকে গর্ভ ধারণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (৯/৯৬) তাই, স্থির হল, চুপিসারে গভীর রাতে নপুংসক স্বামী অথবা গুরুজনের আদেশে সধবা অথবা বিধবা স্ত্রীকে ঘি মাখিয়ে প্রস্তুত করে রাখা হবে, আর ওই রমণীর সাথে কোনো পরিচিত পরপুরুষ রমণ করবে এবং তার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করবেন।কখনো একাধিক পুত্র উৎপাদনের বিধানও দিয়েছিলেন মহর্ষি মনু। (৯/৬০, ৯/৬১) এই গোপন কর্মে পরপুরুষ যত কাছের হবে, ব্যাপারটিও ততোই গোপন রবে। তাই আর্যধর্ম অনুযায়ী দেবর আর ভাসুরের কর্তব্য স্থির হল- গভীর রাতে ভ্রাতৃবধুরমণ। (৯/১৪৬) তবে, দেবর- ভাসুরের অভাবে বংশের অন্য কোনো পুরুষকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। যেভাবেই হোক নরক থেকে নিষ্কৃতি ও স্বর্গ মার্গে পদক্ষেপন করতে তো হবে!

এখন প্রশ্ন হলো গুপ্ত পদ্ধতিতে পুত্র উৎপন্ন হল, এই পুত্র তো স্বর্গগমনেচ্ছুক আর্যপুত্রের ঔরসজাত নয়। তাহলে কি করে সে মৃত্যু-পরে স্বর্গোপরে লীলা-খেলা করবে?

এই প্রশ্ন ও বিস্ময়ের সমাধান দিয়েছেন, মনুসংহিতা। তিনি দাঁড় করিয়েছেন তার 'ক্ষেত্রজপুত্র' নামক থিওরি। এই তত্ত্বে তিনি নারীকে, এবার পরিণত করেছেন ক্ষেতে। মনু বলেছেন, নারী হল পুরুষের ক্ষেত আর পুরুষ এর থাকে বীজ। (৯/৩৩-৩৪) আর খেতে বীজ লাগিয়েই চারাগাছ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু রাম এর ক্ষেতে যদি বলরাম অমাবস্যার রাতে, অন্ধকারে,বীজ লাগিয়ে আসে, আর তাতে ধান, গম এর ফলন হয়, তবে রাম তার ক্ষেতের ফসল বলরামকে দেবে কেন, যতই বলরামের বীজ হোক না কেন?

মনুর ভাষায়,

"যেমন অন্যের গাভী,মহিষী,স্ত্রী উট ও স্ত্রী ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে অন্যের বৃষ, মহিষ,উট এবং ঘোড়া প্রভৃতির মিলনে উৎপন্ন সন্তান গাভী প্রভৃতি পশু মালিকদেরই অধিকৃত হয়ে থাকে; বৃষ প্রভৃতি পশু মালিকদের হয় না। সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্র স্বামীরই হয়ে থাকে। যার ক্ষেত্র নেই কেবল বীজ আছে সে যদি পরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তাহলে তার শস্যফল কিছুই লাভ হয় না। ক্ষেত্রস্বামীই ঐ ফল ভোগ করে থাকে।"

(৯/৪৮-৪৯)

এইভাবেই নারীকে ক্ষেতে রূপান্তরিত করে তাতে নানান জাতের বীজ লাগাতেন প্রতিভাবান আর্যপুত্রগণ।

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবসময় নারীর ইচ্ছার মূল্য দেওয়া হত না, স্বামীর মৃত্যুর পর নারী যাতে স্বেচ্ছায় ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের মাধ্যমে পরপুরুষের সাথে মিলিত হতে না পারে এবং নারীর তথাকথিত সনাতন সতীত্ব যেন কোনোমতে ক্ষুণ্ন

না হয় সেজন্য নারীকে এই কাজ করতে নিরুৎসাহিত করে মনু ভগবান চরম স্ববিরোধী কথা বলেন-

(উল্লেখ্যঃ- **বিধবা নারীর পুনর্বিবাহও নিষিদ্ধ করেছিলেন মনু, কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার সাথে সাথেই পুরুষকে পুনরায় বিবাহ করতে বলেছিলেন।**)

"সন্তান না থাকলে স্বর্গ গমন হয় না একথা ভুল। বালখিল্য প্রভৃতি বহু সহস্র ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ সন্তান উৎপাদন না করেই কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য বলেই অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ করেছেন। সুতরাং ওই সকল ব্রহ্মচারীর মতোই সাধ্বী স্ত্রী সন্তানবতী না হলেও স্বীয় ব্রহ্মচর্য বলেই স্বর্গ গমন করেন।" ৫/১৫৯

ক্ষেত্রজ পুত্রের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু প্রভৃতির জন্মকথা। মহাভারতের রাজা বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে, বংশের গুরুজনেরা তার স্ত্রী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের পদক্ষেপ নেন। মাতা সত্যবতী স্থির করেন তার পুত্র বেদব্যাস দ্বারা মৃত পুত্রের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। ডাকা হল বেদব্যাসকে। গভীর রাতে তিনি বৌদিদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। যেহেতু বেদব্যাস অত্যন্ত কুৎসিত, কদাকার দেখতে ছিলেন তাই অম্বিকা ও অম্বালিকা সম্মত ছিলেন না বেদব্যাসের সাথে পুত্র উৎপাদনে।

সঙ্গমকালে অম্বিকা চোখবুজে কুরু বংশের অবিবাহিত বীর ভীষ্মের কথা ভাবছিলেন, আর অপরদিকে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডু বর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। সহবাসকালে অম্বিকার চোখ বন্ধ থাকার কারণে কারণে তার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেন, আর ভয়ে অম্বালিকার গায়ের রঙ পান্ডু বর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে তার পুত্রের নাম হল পান্ডু।

অর্থাৎ দেখা যায়, বেদব্যাস ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য অম্বিকা ও অম্বালিকাকে একপ্রকার ধর্ষণ করেছিলেন।

কতই না মহৎ ছিলেন আর্যপুরুষগণ। প্রয়োজনে স্ত্রীকে ক্ষেত বানিয়েছেন।সেই ক্ষেতে নানা জাতের বীজ লাগিয়েছেন।সেই ক্ষেত থেকে অদ্ভুত রকম ফলন পেয়েছেন এবং প্রয়োজনে **স্ত্রীদের ধর্ষণও করিয়েছেন!**

তথ্যসূত্র:

১/মনুসংহিতার অধিকাংশ শ্লোকের তর্জমা চৈতালি দত্তের অনুবাদকৃত মনুসংহিতা হতে গৃহীত হয়েছে

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে নারীদের সম্পত্তি বিভাজনের পার্থক্য

মুসলিম এবং হিন্দু আইনে মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ে, ছেলে ও স্বামীর অংশ নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আবার হিন্দু আইনে বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি কতটুকু পাবে এবং সেটা কখন বিক্রি করতে পারবে আর কখন বিক্রি করতে পারবে না-এসব নিয়েও নানা মুখরোচক গল্প রয়েছে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী যিনিই হোন না কেন, তার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ে একইভাবে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন। মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে তবে স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ আর মৃত ব্যক্তির সন্তানসন্ততি বা পুত্রের সন্তানসন্ততি বা তার নিম্নে কেউ না থাকে, তবে স্বামী পবে ১/২ অংশ। এই

সম্পত্তি স্বামীকে দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ২:১ হারে বাটোয়ারা হবে। অর্থাৎ ছেলেরা পাবে ডাবল আর মেয়েরা ছেলের অর্ধেক পরিমাণ পাবে।

যদি মেয়ে না থাকে তবে বাকি সম্পূর্ণ অংশ ছেলে পাবে। আরও স্পষ্ট করে বলি, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী একজন মেয়ে ৩ নিয়মে মৃত ব্যক্তির সম্পদ পেয়ে থাকে।

১। যদি একজন মেয়ে হয় তবে দুইভাগের একভাগ (১/২) অংশ পাবে অর্থাৎ বাকি সম্পত্তির অর্ধেক মেয়ে পাবে।

২। যদি একাধিক মেয়ে হয় তবে সবাই তিন ভাগের দুই ভাগ (২/৩) অংশ পাবে।

৩। যদি মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে উভয়েই থাকে, তবে ছেলে যে পরিমাণ পাবে, মেয়ে তার অর্ধেক পাবে। কাজেই 'মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা বেশি পাবে' এই ধারণাটি ভুল।

এবার দেখা যাক **হিন্দু উত্তরাধিকার** আইনে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কোন পুরুষ মারা গেলে তার সম্পত্তির ওপর প্রথমে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবার অগ্রাধিকার। এদের অনুপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে কন্যা, দৌহিত্র্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্ররা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হন। কিন্তু কোন হিন্দু মহিলা মারা গেলে তার সম্পত্তি বণ্টনের দুটি নিয়ম রয়েছে।

কোন মহিলা যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তির মালিক হন তাহলে তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে যার নিকট হতে পেয়েছিলেন তার নিকট আত্মীয়দের নিকট ফিরে যাবে।

উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোনভাবে যদি কোন সম্পত্তির মালিক হন, তাহলে সেই সম্পত্তি মালিকানার ধরন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারদের মধ্য বণ্টিত হবে। **১৯৩৭** সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী মেয়েরা কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়। তবে বিধবা হওয়ার পর সন্তান নাবালক থাকা অবস্থায় শুধু বসতি বাড়ির অধিকারী হয়।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী যিনিই হোন না কেন, তার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ে একইভাবে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন

দীর্ঘ ৮৩ বছরেও হিন্দু আইনে আর কোন পরিবর্তন না আসায় ২০২০ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করেছে যে, হিন্দু বিধবারা স্বামীর সব শ্রেণীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ১৯৩৭ সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী বিধবা প্রাপ্ত সম্পত্তি কোন প্রকার বিক্রি, হস্তান্তর করতে পারবে না। শুধু ভোগদখলকৃত বলে গণ্য হবে।

তবে একজন হিন্দু বিধবা কি কি উদ্দেশ্যে তার স্বামীর সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে বিক্রি হস্তান্তর করতে পারবে, সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা ছিল। যেমন স্বামীর দাহ এবং শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে টাকার প্রয়োজন হলে জমি বিক্রি করতে পারবেন, স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য ধর্মীয় ও দাতব্য কাজ করতে গিয়ে, মৃত স্বামীর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে, প্রভেট, সাকসেসন সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে গিয়ে, সরকারি বকেয়া কর বা রাজস্ব পরিশোধে, যুক্তিসংগতভাবে নিজের ভরণপোষণ ম্যানেজ করতে গিয়ে, পারিবারিক ব্যবসা বা অন্য কোন পারিবারিক প্রয়োজনে দেনা হয়ে থাকলে, তা পরিশোধ করতে গিয়ে মৃত স্বামীর আত্মীয়দের যেমন-মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ছেলের ছেলের মেয়ে ইত্যাদি বিয়ের খরচ মেটানো ও যৌতুক প্রদান করতে গিয়ে, সম্পত্তির উন্নতিকল্পে, সম্পত্তি রক্ষার জন্য, মামলা মোকদ্দমার খরচ মেটাতে গিয়ে বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন।

নারীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে বলা হয়েছে-

"বন্ধ্যা নারী অর্থাৎ যার স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে গ্রাসাচ্ছাদন বহনোপযোগী অর্থ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে,পুত্রহীন প্রোষিতভর্তৃকা , যে স্ত্রীর কোনো সপিণ্ড অভিভাবক নেই অথচ যে নিজে সাধ্বী, বিধবা এবং রুগ্না স্ত্রী – এদের সকলের ধন অনাথ বালকের সম্পদের মতোই রাজা নিজে রক্ষা করবেন।" ৮/২৮

এরপর সর্বশেষ রায় অনুযায়ী একজন হিন্দু বিধবা তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার অধিকারী এমনকি মৃত ব্যক্তির মৃত পুত্র (যিনি তার পূর্বে মারা গেছেন) বিধবা স্ত্রী তার সম্পত্তিতে অধিকারী হিসেবে হিস্যা পাওয়ার অধিকারী যেমনটি তার ছেলে জীবিত থাকলে পেত। একজন হিন্দু বিধবা আইনে যে কোন সম্পত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মালিক ও যে কোন অংশীদারিত্বসহ অংশীদারী হওয়ার অথবা বিভাগ বণ্টন এবং অগ্রক্রয়ের দাবিদার হওয়ার অধিকারী। **(সিভিল রিভিশন নং ২৪৭৭/২০০৪)**।

ইতিকথা

ইসলাম ধর্মে নারীর জন্য বাবা,ভাই,স্বামী,ছেলেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্মান,আদর,যত্ন এবং ভালোবাসায় রাখার জন্য।এক নারীর জন্য চারজন পুরুষ লালন পালন এবং সম্মানের স্বার্থে নিয়োজিত।

বাবার কন্যা রহমত,ভাই এর বোন সম্পদ,স্বামীর স্ত্রী রাব্বাইতুল বাইত,ছেলের মা জান্নাত।মহান আল্লাহ সুবহানু তা'আলা অশেষ মর্যাদা দিয়েছেন নারীদের যা আলোচনা থেকে প্রমাণিত।

অপরদিকে নারীকে ভোগের বস্তু,শয়তানের প্রবেশদ্বার,অকল্যাণের প্রতীক এমন কি অপবিত্রতার প্রতীক হিসেবেও ব্যাবহার করা হয়েছে হিন্দু ধর্মে।নারীর কোনো অধিকার নেই,বিবাহ কিংবা সম্পদে কোনো মতামত নেই,ঘরের সিদ্ধান্তে নেই কোনো মূল্যায়ন।নারীদের কে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যে অর্থের যোগানদাতা মনে করে কেবল সামগ্রীর মতো কেনা বেঁচা করার মতো ব্যবসা করেছে। নারীদের সম্ভ্রম হানির মতো নিকৃষ্ট কাজ কে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ভালো বলা হয়েছে!

নারীর আরামের শান্তির জীবন দেওয়ার বদলে তাদের মাথায় ফেমিনিজম এর ভুল ব্যাখ্যা প্রবেশ করিয়ে টাকা কামাই এর পরিশ্রমের যুদ্ধে ধাবিত করছে আরেক দল হিপোক্রেট।তারা নিজেরা নারীদের দায়িত্ব নিবে না বলেই এই অবস্থা।এর শুরুটা ও হয়েছে হিন্দু ধর্ম থেকে ।

তাই পরিশেষে বলা যায় নারীকে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা হয়েছে ইসলাম ধর্মে।